অমৃত-মঞ্জুষা

(স্মরণীয় একটি সপ্তাহ)

ব্রহ্মচারিণী জ্যোতির্ম্ময়ী।

শ্রীগুরু আশ্রম—ব্যারাকপুর।

প্রকাশক :—
শ্রীগুরু আশ্রমের পক্ষ হইতে
মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত।
১৮ নং, রিভার সাইড রোড,
ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা।

দোলপূর্ণিমা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ

প্রণামী দুই টাকা

প্রিণ্টার—
শ্রীসুনীলচন্দ্র পাল
১২১ বি, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—৯

অমৃত-মঞ্জুষা

(স্মরণীয় একটি সপ্তাহ)

"কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই !
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই !

পুরাণো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি—কি জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে-কথা যে ভুলে যাই !"

—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

"এ মর-জগতে সাকার যে-জন
শৃঙ্খল তাহার অঙ্গের ভূষণ।
...কিন্তু, নাম-রূপ পারে
নিত্য-মুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

"—এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক্।
চৈতন্যের শুভ্র-জ্যোতিঃ ভেদ করি' কুহেলিকা,
সত্যের অমৃতরূপ করুক প্রকাশ।"

—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

"নীলকণ্ঠকে আদর্শ করে যে ব্যক্তি বলতে পারে—আমার মধ্যে আনন্দের উৎস খুলে গেছে, তাই আমি সংসারের সকল দুঃখকষ্ট নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি; যে ব্যক্তি বলতে পারে—আমি সব যন্ত্রণা-ক্লেশ মাথায় তুলে নিচ্ছি, কারণ এর ভিতর দিয়ে আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি—সেই ব্যক্তিই সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে।

আমাদের আজ এই সাধনায় সিদ্ধ হতে হবে। নূতন ভারত যারা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে—সারা জীবন কেবল দিয়ে যেতে হবে -নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কাঙ্গাল হয়ে যেতে হবে—প্রতিদানে কিছু না চেয়ে। নিঃশেষে জীবন দান করেই জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যারা এরূপ সাধক হবে তাদের সম্পদ থাকবে কেবল অন্তরের আত্মবিশ্বাস, আদর্শানুরাগ ও আনন্দবোধ।"

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

উৎসর্গ

ওঁ॥

পূজনীয় পিতৃদেব,

"তোমার পতাকা যারে দাও,
তারে বহিবারে দাও শকতি।"

বাবা, অমৃতের সন্ধানে একদা আপনি নিজে আমার হাত ধরে শ্রীগুরু-সকাশে অর্পণ করেছিলেন। 'স্মরণীয় একটি সপ্তাহ' শ্রীগুরু-সঙ্গে ৺তীর্থধামে যাপন করেছি। অমৃতের পেটিকা এই "অমৃত-মঞ্জুষা"—আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি।

তারই সঙ্গে দিলাম—আপনার "অপরাজিতা"র হৃদয়োত্থিত সকৃতজ্ঞ আনন্দাশ্রু-বিজড়িত এক লক্ষ প্রণাম।

শ্রীগুরু আশ্রম, ব্যারাকপুর।
দোল-পূর্ণিমা, ১৩৫৯

শ্রীগুরু চরণাশ্রিতা,
—ব্রহ্মচারিণী জ্যোতির্ম্ময়ী।

সূচী-পত্র

—:*:—

নিবেদন

ওঁ॥

"বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং শ্রীমদ্‌গুরুম্।
নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং স্বাত্মসংস্থিতম্॥"

* * * * *

হে সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষক গুরো! ওগো দয়াল ঠাকুর!
তোমারই রোপিত মুক্তি-বীজ,
—তোমারই অমোঘ আশিস-বারি-সিঞ্চনে আজ নবকুসুমিত।...
সর্ব্ব জীব-হৃদয়ে আসন গ্রহণের জন্য—এ আয়োজন তোমারই।...

—প্রভু!

তুমিই স্বকীয় মহিমায় নিজে আসিয়া,
তোমার আসন তুমিই গ্রহণ করিয়া,
তোমার পূজায় তুমিই প্রীত হও।...
—তোমার বিশ্বের প্রীতি হউক।...

তোমার শ্রীচরণাশ্রিতা সেবিকার একটি প্রাণ-ঢালা প্রণাম গ্রহণ করিয়া, তাহার জীবন ধন্য কর, দেব।...

—প্রভু!

লহ মোর একটি প্রণাম—

"আজিকার এই শুভক্ষণে
লহ মোর একটি প্রণাম।
আশীষ করগো তারি সনে
(যেন) কণ্ঠে বাজে তব নাম।
আমার আমিরে ধর উজাড় করিয়া প্রিয়,
মুছে দিয়ে পঙ্কিল এ হাত ধরিয়া নিও;
তোমার কৃপার বারি, শিরেতে সদাই ধরি,
তোমার পূজার ফুল কর মোর নাম।
বহু আশা হৃদে ধরি' আসিয়াছি তব দ্বার,
ঘুচাইয়া অহমিকা মুছাও নয়নধার।
কতবার এসে প্রিয় তোমার চরণ তলে,
উজাড় করিতে মোরে এ ফাঁস পরেছি গলে,
সে ফাঁস খুলিয়া স্বামী, ঘুচাও আমার আমি,
কৃপা সিঞ্চিত করে শিখাও প্রণাম।"

শ্রীগুরু আশ্রম, ব্যারাকপুর।
দোল-পূর্ণিমা, ১৩৫৯

শ্রীগুরু চরণাশ্রিতা,
—ব্রহ্মচারিণী জ্যোতির্ম্ময়ী।

ভূমিকা

আনন্দ-মঠে সন্তান নিরাশায় দিশেহারা।...

ভূমিতে দাঁড়িয়ে উর্দ্ধে দুই বাহু তুলে ভূমাকে জিজ্ঞাসা করলেন অমৃতের সন্তান,—"মা, আমার মনস্কাম কি পূর্ণ হবে না ?"

দিগন্ত-ধ্বনি হল,—"তোমার পণ কি ?"

সন্তান হাঁকলেন,—"পণ আমার—জীবন-সর্ব্বস্ব।"

উত্তর এল,—"জীবন তুচ্ছ,—সকলেই দিতে পারে।"

সন্তানের আকুল প্রশ্ন,—"তবে কি ? তবে কি ?"...

দৈব-বাণী উত্তর দিলেন,—"ভক্তি।"

... ...

"এস অপরাজিতা বাণী

অসত্য হানি'।"...

... ...

—এই ভক্তি-হারা হয়েই আজ আমরা শক্তি-হারা !...

জ্ঞান ভক্তি-সাপেক্ষ। কর্ম্ম জ্ঞানাশ্রয়ী। ভক্তি-হারা হয়েই আজ আমরা যুক্তি-হারা, সুতরাং শক্তি-হারা,—তাই মুক্তি-হারা

সমাজের সর্ব্বক্ষেত্রে কুত্রাপি আমাদের এতটুকুও যেন নিষ্ঠা নেই, শ্রদ্ধা নেই,—তাই আচার নেই, বিচার নেই।...

বিনয় নেই,—তাই বিবেক নেই, বৈরাগ্য নেই। নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই,—আত্ম-সংযম, আত্মবিশ্বাস-ও নেই।

আদর্শানুরাগ নেই বলেই না,—তার অনিবার্য্য ফল-স্বরূপ জীবনে জীবনে আনন্দবোধ-ও নেই।

অবিদ্যার ফল—অহঙ্কার, এই সর্ব্বনাশা ঔদ্ধত্য।...

"ওরাও মানে না, তাই জানে না"।...

সমস্ত শুভবুদ্ধিই তাই আমাদের—অন্তর্হিত-প্রায়। অন্তর-জীবনও আমাদের যেন ঝিমিয়ে পড়েছে—দিন দিন।

... ...

মন,—সে তেজস্বী অশ্ব, সতত গতি-চঞ্চল, সর্ব্বদা সংশয়-অস্থির,—ব্যস্তবাগীশ। ইতস্ততঃ লক্ষ্যহীন ভাবে সে বিচার না ক'রে কেবলি বিচরণ করতে চায়—গগনে পবনে।...

একমাত্র বুদ্ধি আরোহীরূপে তাকে নিয়মিত করেছে যদি, সে মনোবেগ কল্যাণ-প্রসূ।

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ,—বুদ্ধি-হস্তে দুটি বল্গা।

... ...

গুরু গোবিন্দ বলছেন,—

"তুরঙ্গম সম অন্ধ নিয়তি
বন্ধন করি' তায়,
রশ্মি 'পাকড়ি' আপনার করে,
বিঘ্ন-বিপদ লঙ্ঘন ক'রে,
আপনার পথে ছুটাই তাহারে,
—প্রতিকূল ঘটনায়।"

... ...

একদা অপরাজিতা-মা বলেছিলেন,—

"মন যা দেয়—তা' মন্দ

ভালে যা ঢালে—তা' ভাল।"

একই কথা,—কিন্তু কী সার-গর্ভ!···

বুদ্ধিস্থান—ভালে, সে অদৃষ্টকে-ও দৃষ্ট করে দেয়।

·· ··· ···

জ্ঞান কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে,— শুভ-বুদ্ধিকে জাগ্রত করে—

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং।"

—জীবন তখন গুণে-জ্ঞানে ঝল্‌মলিয়ে ওঠে।...এতো আর আমাদের শুষ্ক পাণ্ডিত্যাভিমান নয়। বিবেক-বৈরাগ্যবিহীন পাণ্ডিত্য—বন্ধ্যা, সৃষ্টিক্ষম সেবাব্রতী বীজ বা ক্ষেত্র সে কোনটাই হতে পারে না—কখ্‌খনো।

বিনয় এবং আচার মিলে-ঝুলে প্রকৃত জীবন-প্রগতি রচনা করে। ভক্তিকে স্ব-শক্তিতে আহ্বান করে তখন!

—জ্ঞান প্রতিভাকে উদ্দীপিত করে,

—কর্ম্ম চরিত্রকে সংগঠিত করে।

ফলে,—জীবন-বেদ রচিত হয়, শক্তি আহৃত হয়, ভূমিতে ভূমার প্রেম-প্রকাশ উপলব্ধ হয়, দীপ্ত শান্ত সমাহিত হয়—অনন্ত সত্যে, আনন্দ-স্বরূপে।

—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

"যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।"

··· ··· ···

জ্ঞান ও ধ্যানের ধাত্রী পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ।

ভারতের শক্তি-উৎস গুরুগৃহ,—ভারতের তপোবন। প্রকৃতির অতি মনোরম পরিবেশে সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা, ও শস্য-শ্যামলা তপোবন ছিল—অতীত ভারতে মানব-সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র আদি বিদ্যাপীঠ। সে—

"ভারত-অরণ্যে ঋষিদের গান,
অনন্ত-সদনে করিত প্রয়াণ,
তোমারে চাহিয়া পুণ্য-পথ দিয়া,
—সকলে মিলিয়া চলিত।"

বিশ্ব ও বিশ্বদেবের পরম সত্য-সূত্রটি সমদর্শী আচার্য্যগণ নিভৃত-আশ্রমে আবিষ্কার করলেন, স্বীয় জীবনে তাব প্রকাশ প্রতিফলিত করলেন, এবং বিশ্ববাসীকে জন্ম-মৃত্যুর অতীত, অক্ষয় মানব-ধর্ম্মের সে চরম সত্য-দর্শনে আহ্বান জানিয়ে, হাঁকলেন,—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ!"

বললেন,—"মরণের পরপারে যে সত্য-সুন্দর জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে, ওগো, জেনেছি তাঁকে,—তিনি ওঁ,—রূপ ও অরূপের ওপার—তিনি। তিনি—

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥'

তিনি—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্।
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্॥'

... ...

আশ্রমের মধ্যমণি—আশ্রমাচার্য্য। তিনি গুরু—জ্ঞানস্বরূপ। তিনি রহস্যভেদ করেছেন, লোক-শিক্ষার্থে তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যাশ্রম খুলেছেন! অনাসক্ত, প্রেমসিক্ত, জ্ঞানদীপ্ত তাঁর কর্ম্ম-জীবনকে কেন্দ্র ক'রেই বিদ্যার্থী ও শরণার্থী—প্রতিটি জীবন তখন কঠোর সংযমের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হত,—মধুময় হয়ে উঠতো। অচলা গুরুভক্তি শিক্ষার্থীর শিক্ষা-শক্তি বৃদ্ধি করতো।...

গুরু শিষ্যের বুকে অনন্ত জিজ্ঞাসা জাগিয়ে বলতেন—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।"...

সকল সংশয় নিরসন ক'রে জিজ্ঞাসু জীবন-সত্তাকে শিক্ষায় দীক্ষায় প্রাণবন্ত ও সত্য-নির্ভর ক'রে তুলতেন সস্নেহ লালনে শ্রীগুরু স্বয়ং।

✢ ✢ ✢ ✢

ফলে,—কি ব্যবহারিক, কি পারমার্থিক, জীবনের উভয় স্তরে—ভূমিতে এবং ভূমায় ভারত একদা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। শৌর্য্যে-বীর্য্যে ও জ্ঞান-গরিমায়, শুভ্র-চরিত্রে ও ঐশ্বর্য্য-সম্পদে জগতে ভারত বরেণ্য ছিল।

✣ ✣ ✣ ✣

...শক্তি-স্বরূপিনী নারী তখন স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। মনু বলেছেন,—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে তত্র রমন্তে সর্ব্ব দেবতা।"

স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে অনেকেই বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হতেন তখন। অতীত ভারতের মনস্বিনী মদালসা, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী,

গার্গী, মৈত্রেয়ী. খনা, লীলাবতীর সূক্ষ্ম বিচার-প্রতিভা ও দীপ্ত চরিত্রপ্রভা বিস্ময়কর।...

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা!" নারী-শক্তি সেই অরূপা-শক্তি--৺দুর্গা. ৺কালী, ৺কমলা, ৺সরস্বতী. দেশমাতা, জগদ্ধাত্রী-রূপে পূজ্যা। ৺জগজন-পূজ্যার জীবন্ত মূর্ত্তি ভারতের গৃহে-গৃহে জননী. জায়া, কন্যা ও ভগিনীরূপে বিরাজিতা। ঘরে-ঘরে তেজস্বিনী বীরাঙ্গনাকুলের অনুপম বীর্য্যবত্তা ও আত্মোৎসর্গ, সততা. শুচিতা, লোকহিতব্রত ও সেবাপরায়ণতা অতুলনীয়।...

রাণীভবানী, অহল্যাবাঈ, মীরাবাঈ. দুর্গাবতী, চাঁদবিবি, লক্ষ্মীবাঈ, রায়-বাঘিনী, রাণীশিরোমণি ও দেবী চৌধুরাণীর দান-ধ্যান ও দেশপ্রেম রমণী মাত্রেরই কল্পলোক রাঙিয়ে তোলে।—সে প্রাণ-বীজ এখনও রয়েছে, তাই।

—সে জ্ঞান-দীপ ধিকি-ধিকি জ্বলছে—যদিও নিভু-নিভু প্রায়। কিন্তু,—

"নিভিবে না সে. দিবে অনন্ত জ্যোতি।"

卐 卐 卐 卐

স্বামিজী, গুরুজী, নেতাজী,—বাংলার সত্যরূপ, সুন্দর-রূপ, শিব-রূপ। এই ত্রয়ী পুরুষ-ব্যাঘ্র ইদানীং বাঙলাকে অমৃতের সন্ধান দিয়েছেন। সে সঞ্জীবনী-মন্ত্রে নূতন বাঙলা তপস্যায় গড়ে উঠছে।...

ভাঙা-গড়ার নিত্য-খেলায় ভারতের অচঞ্চল সনাতন সমন্বয়-দৃষ্টি বাঙলার নিভৃতে নিরালায় জেগে আছেন, বলছেন,—

"এ নিশীথ মাঝে আমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।"

✤ ✤ ✤ ✤

সত্য—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

সেই সত্য—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।

এই ত্রয়ী মহাপুরুষের জীবন-দর্শনের জ্বলন্ত মূর্ত্ত-বিগ্রহ ব্রহ্মবিদ্ আমাদের আশ্রমাচার্য্য শ্রীগুরুদেব।

তাঁরই স্বপ্নে গড়া সন্তান—তপস্বিনী ব্রহ্মচারিণী জ্যোতির্ম্ময়ী-মা —নয়া বাংলায় শ্রীগুরু-দাক্ষিণ্যের এক অপরূপ দান। ভাবী বাঙলার সে এক জ্যোতির্ম্ময়ী-রূপ।—সে রূপ অপরাজিতার।

✤ ✤ ✤ ✤

যুদ্ধপূত রাজপুতানায় জন্ম তাঁহার,—দেশভক্ত বঙ্গ-রক্ত তাঁকে প্রেম-পাগলিনী করেছে।

প্রথম জীবনে পিতৃ-সান্নিধ্যে শিক্ষা, ও মধ্যজীবনে শ্রীগুরু-সমীপে দীক্ষা তাঁকে নিষ্ঠায় ও স্নেহে-প্রেমে করেছে পরম রমণীয়।

৺বৈদ্যনাথধাম দর্শনে "স্মরণীয় একটি সপ্তাহ" তিনি শ্রীগুরু-সঙ্গে যাপন করেছেন। সেই গাথা এই গ্রন্থে গাঁথা। অমৃতের ঝাঁপি—সত্যিই এই "অমৃত-মঞ্জুষা"।

✤ ✤ ✤ ✤

সন্তানকে ঠাকুর শিখাচ্ছেন—"মৃত্যু নেই, মৃত্যু মিথ্যে কথা।—'আত্মানং বিদ্ধি'—জানো আপনাকে।…'মৃত্যু মরেছে চরণে তোমার'

—সে এক—অমর জীবন।...” অমৃতের সন্ধানে যাত্রীদলের জয়—
“ওরে মন, হবেই হবে।” গুরুদেব,—“দেহি পদ পল্লবমুদারম্।”

জগদ্ব্যাপী জন-গণ-প্লাবী—

“দারুণ বিপ্লব মাঝে,

তব শঙ্খ-ধ্বনি বাজে,”—

“ওঁ সত্যমেব জয়তে ধ্রুবম্” ॥

“জয় গুরু”! “জয় হিন্দ্” ॥

শ্রীগুরু আশ্রম, ব্যারাকপুর।
দোল-পূর্ণিমা, ১৩৫৯

বিনীত আশ্রম-সন্তান,
শ্রীসত্যভূষণ গুপ্ত।

———



শ্রীশ্রীঠাকুর

—সে এক—অমর জীবন।...” অমৃতের সন্ধানে যাত্রীদলের জয়—
“ওরে মন, হবেই হবে।” গুরুদেব,—“দেহি পদ পল্লবমুদারম্।”
জগদ্ব্যাপী জন-গণ প্লাবী—

“দারুণ বিপ্লব মাঝে,

তব শঙ্খ-ধ্বনি বাজে,”—

“ওঁ সত্যমেব জয়তে ধ্রুবম্” ॥

“জয় গুরু”। “জয় হিন্দ্” ॥

শ্রীগুরু আশ্রম, ব্যারাকপুর।
দোল-পূর্ণিমা, ১৩৫৯

বিনীত আশ্রম-সন্তান,
শ্রীসত্যভূষণ গুপ্ত।



শ্রীশ্রীঠাকুর

অমৃত-মঞ্জুষা

২

আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর

আমাদের বরণীয় শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ আবির্ভাবক্ষণ স্মরণীয় অরণ্য-ষষ্ঠী দিবস। পরমলগ্নে তিথি-পূজা হইয়া গেল। শ্রশ্রীঠাকুর তাঁহার আরাধ্য পিতৃদেবের সাদর স্নেহের আহ্বানে ৺বৈদ্যনাথধামে যাত্রা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বহুদিন যাবৎ আমাদের পূজনীয় দাদুভাই তাঁহার একান্ত আদরের দুলাল পুত্রকে একবার দর্শন করিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া বার বার পত্র দিতেছিলেন। আশ্রমস্থ আমাদের সকলেরই মনে বড় সাধ জাগিতেছিল—কত দিনে পুণ্যগৃহে পূর্ণচন্দ্রের উদয় পিতৃবক্ষে দেখিতে পাইব—কত দিনে পূজনীয়া শ্রীশ্রীঠাকুরমাতা সযত্নে সোহাগভরে তাঁহার আদরের নিধিকে তাঁহার ক্রোড়ের কাছে একান্তে টানিয়া লইয়া বসাইবেন এবং স্বহস্তে ভোগপ্রসাদ মুখের কাছে তুলিয়া ধরিবেন, —সে রমণীয় দৃশ্য দর্শনে আমরা কৃতকৃতার্থ হইব, কবে বলিব—"ওরে তোরা চল্, দেখবি চল্—নন্দকুলে চন্দ্রোদয়—কৃষ্ণপক্ষ আজ শুক্লপক্ষ!"

৮ই জুন, ১৯৫০। বৃহস্পতিবার। তখন অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা। সমস্ত আশ্রমে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। কোথা হইতে ঝড়ের বেগে বিভূতিভূষণ ছুটিয়া আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"পিসীমা, তা' হলে কি কাল সত্য-সত্যই ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের ৺বৈদ্যনাথধাম যাওয়া হবে? বলিলাম—"হ্যাঁ বাবা, এখনও তাই শুনছি। যাওয়া হবে বলেই মনে হচ্ছে, তারপর ঠাকুরের ইচ্ছা। দেখ কি হয়। তবে তাঁর আদেশ মত সমস্ত গুছিয়ে নিচ্ছি। তোমরা সকলে এস, শীঘ্র জিনিষ পত্র গুছিয়ে নাও।"

তখন আর বিভূতিকে পায় কে! সবাইকে ডাকিয়া হাঁকিয়া বিভূতিভূষণ হৈ হৈ লাগাইয়া দিলেন। "মুরলী-দা, কালী-দা, তারা-দা, প্রতুল-দা, সুধীর-দা, মঞ্জু-ভাই, শৈল-মা, অমলা-মা"—সকলের নাম করিয়া সকলকেই ডাকিলেন। হোল্ড-অল পাতিয়া শয্যা গুছানো হইল। ক্রমে একে একে বাক্স-পেটরা, পুঁথি-পত্রাবলী সমস্তই গুছানো হইল।

আশ্রম সন্তানগণ আশ্রমাচার্য্যের কাছে অহরহ এই শিক্ষাই পাইতেছেন যে, জগতের যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ-কর্ম্ম ধর্ম্মকেই ঘোষণা করিতেছে। পূজার মনোবৃত্তি লইয়াই তাঁহারা প্রত্যেকে প্রতিনিয়ত ইহাই অনুভব করিতে চান—"যৎ করোমি জগন্নাথস্তদেব তব পূজনম্।" আমি ভাবিলাম—যতই যাহা গুছাইয়া লই না কেন, জীবন্ত বিগ্রহ-মূর্ত্তির পূজায় যেন কিছুটা ভুল ত্রুটি থাকিয়াই যায়। সাধ্যমত চেষ্টা করি—তবু যতটুকু হয়।"

সমস্তই গুছানো হইল। সন্ধ্যায় আমরা সকলে মুখ, হাত, পা ধুইয়া আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম ও সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। সহাস্য বদনে প্রেমোচ্ছল নয়ন-দুটি আমাদের দিকে তুলিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"তোরা এতক্ষণ কোথায় ছিলি? কি এত গোছাচ্ছিলি?—বোস্।"

সকলেই বসিলাম। সেখানে বহু ভক্তবৃন্দের সমাগম হইয়াছে। আশ্রমের অন্যান্য ভাই-ভগ্নীগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ-তলে উপবেশন করিয়াছেন। সকলেরই চোখে-মুখে যেন কী একভাব! এক এক ভক্তের এক একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতেছে। ধীরে ধীরে কেহ বলিতেছেন—"বাবা, আপনি শীঘ্র শীঘ্র চলে আসবেন কিন্তু। এখান থেকে চলে গেলে আপনার এখানকার কথা যেন আর মনেই থাকে না। এবারে কিন্তু ঐরূপ করবেন না। দু'দিনের বেশী সেখানে থাকবেন না যেন।" কেহ কেহ নয়নধারা অতি গোপনে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখপানে আমরা চাহিয়া দেখিলাম—আশ্বাস-দ্যোতক এক অভয়-দীপ্তি তাঁহার চোখে-মুখে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। স্মিতহাস্যে তিনি সকলকে বলিলেন, "ওরে, আমি শীঘ্রই ফিরছি, এই ত' দু'দিনের জন্যে যাচ্ছি মাত্র। নেহাৎ যদি বিশেষ কোনো কারণে না আটকে যাই, আমি সোমবারই আসছি।"

আমরা ভাবিলাম—"হে ঠাকুর, আপনার আর বিশেষ কারণ কি-ই বা থাকতে পারে? আপনি স্বয়ং কারণের কারণ—বিশেষের বিশেষ; আপনি নিজেই নিজ ইচ্ছায় যে কারণের উৎপত্তি ঘটাতে

পারেন, আপনার কথার সে বুৎপত্তি আমাদের অজানা নয়। হে প্রভু, হে দয়াল দেব, আপনার প্রকাশিত অভিপ্রায়ের অন্তর্নিহিত অর্থ আপনি কৃপা পরবশ হয়ে বুঝিয়ে না দিলে কার সাধ্য তার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করে? ওগো আত্মভোলা সন্ন্যাসী, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমাদের ধী-শক্তিকে দীপ্ত করুন।”

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। নীরবে, নিস্তব্ধতার মাঝ-খানে ভাব-গম্ভীর পরিবেশে আমরা আশ্রম সন্তানগণ শ্রীগুরু উদ্দেশ্যে মনে মনে প্রাণে প্রার্থনা করিলাম—

ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি,
নমস্তেঽস্তু, মা মা হিংসীঃ।

—ওগো জ্ঞানময় গুরুদেব, আপনি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান-শিক্ষা দিন; আপনাকে নমস্কার। আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না।”

* * *

সাড়ে নয় ঘটিকা বাজিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের সময় হইল। ভোগ-মন্দির হইতে এই সংবাদ আশ্রম-প্রাঙ্গণে পৌঁছাইল। শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরে আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সকলে একে একে শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করিলাম। হাজারিবাগ-বাসী ভক্তবৃন্দের অনেকেই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আশ্রমবাসী আমরা এবং কতিপয় অভ্যাগত ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আশ্রম গৃহে প্রবেশ করিলাম। পরে শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন। বিভূতিভূষণ তাঁহার শ্রীহস্তপদ প্রক্ষালন

করাইয়া দিলেন। অতঃপর আমরা তাঁহার পিছু পিছু ভোগ-মন্দিরে পৌঁছাইলাম। তিনি ভোগে বসিলে পর আমরা সকলে —আশ্রমের ভাই ভগ্নীগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বসিলাম। ছোট ছোট দুইটি মেয়ে মায়া আর মমতা শ্রীশ্রীঠাকুরের দুই পার্শ্বে দুইখানি বড় বড় ব্যজন আন্দোলিত করিতেছে। আহা, কি চমৎকার দৃশ্য! আগামীকল্য বিদায় দিবস—মাত্র দুইদিনের অনুপস্থিতি—মায়া ও মমতা যেন সোহাগ ব্যজন দিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিতেছে। আমরা সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছিলাম না। নিবেদনান্তে সামান্য কিছু ভোগ গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে—"এটা কে রেঁধেছে, ওটা কে দিয়েছে, এটা এল কোত্থেকে—ওকে দেখছি না যে"—এইরূপ ঘরোয়া কথোপকথনের মধ্যে ঠাকুর ভোগ শেষ করিলেন।

পরে দর দালানের সকল ভক্তবৃন্দের আহারের ব্যবস্থা হইল। প্রসাদ পরিবেশন কালে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং তদারক করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সকলের প্রসাদ গ্রহণ শেষ হইল। সকলেই যথাশীঘ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়ন গৃহে পৌঁছাইলাম। কক্ষটি ভক্তে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পালঙ্কোপরি গুরুদেব অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন। বিভূতিভূষণ ও পণ্ডিত কালীপদ, উভয়ে অনুমতিক্রমে পালঙ্কোপরি উঠিয়া শ্রীপাদপদ্ম দুইখানি ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। আমরা মনে মনে তখন ভাবিতেছি—হে দয়াময়, এইভাবে যেন শ্রীচরণ

অর্চ্চনায় আমাদের মতি ও গতি রয় সর্ব্বদা, জাগ্রত শুভবুদ্ধির অনুপ্রেরণায় লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য স্থির হয়।

* * *

এইবার এইখানে একটি কথা বলি। ইহা বহুবারই আমরা পূজনীয় শ্রীশ্রীঠাকুরমাতার মুখে শুনিয়াছি। একবার আমার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, ঠাকুরের সন্ন্যাসী শরীর, তিনি পিতা মাতার নিকট কেমন করিয়া যাইবার প্রয়োজন অনুভব করিতে পারেন। এই প্রশ্ন আমি প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে নিবেদন করি। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরমাতা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া ইহার ঐতিহাসিক আখ্যানটুকু আমাদের কাছে ব্যক্ত করেন। ঠাকুর কৃপা পরবশ হইয়া সন্তানের এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন। যখন শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ন্যাস লইবার জন্য মাতৃ-আজ্ঞা পাইতে বহু আয়াস করিয়াও বিফল মনোরথ হন সেই সময় কালীঘাটে ৺মায়ের মন্দিরে তিন দিন চোখের জলে বুক ভাসাইয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে কালভয়বারিণী ৺মায়ের কৃপা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। সন্তান-বৎসলা স্নেহময়ী জগজ্জননী সন্তানের এই কাতর প্রার্থনা অবহেলা করিতে পারেন নাই। ৺দয়াময়ী তিন দিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের গর্ভধারিণী জননীর মন প্রস্তুত করিয়া দিয়া ঠাকুরের সন্ন্যাস লইতে অনুমতি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু জননী-হৃদয় এই অনুমতি দিয়াও সন্তানকে দিয়া একটি সত্য করাইয়া লইয়াছিলেন,—"যখন যে স্থানে যে অবস্থায় তুমি থাক—আমি

ডাকলেই তোমায় আসতে হবে, এবং আমি নিজে রান্না করে দিলে তোমায় তা' খেতে হবে।"

আমাদের পরমারাধ্য দাদাগুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও আজ তাই তিনি তাঁহার গুরুদেবের আদেশে মাতৃ-সত্য পালনে বাধ্য!

পূজনীয় দাদাগুরু কেন এই আদেশ দিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর আমাদের যাহা বলিলেন, এইবার সবিস্তারে সে-কথার উল্লেখ করি। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার মাতৃ-সংবাদ গুরু সমীপে নিবেদন করিলে তদীয় গুরুদেব বলিলেন—"বৎস, পিতা মাতা পরম পূজনীয়, অতএব মাননীয়। মহাভারতের আদি-পর্ব্বে উল্লিখিত হয়েছে—

'গুরুণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকো গুরু।'

—সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু;

আর, বন-পর্ব্বে বলা হয়েছে—

'মাতা গুরুতরো ভূমেঃ, খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।'

—মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গুরু, পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র বলছেন—

'মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।

মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥'

-মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-দেবতা স্বরূপ জেনে গৃহী সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁদের সেবা করবেন।

পুনরোপি তন্ত্র বলছেন—

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুল পাবনঃ॥

—কুল-পাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদু-বাক্য বলবেন, সর্ব্বদা প্রিয়-কার্য্য করবেন এবং আজ্ঞাবহ থাকবেন।

মনু বলছেন—

'যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥'

—সন্তান হলে পিতা-মাতা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র শত বৎসরেও তার পরিশোধ করতে শক্ত হন না।

মহর্ষি জমদগ্নি মুনির বিখ্যাত উক্তি তোমার অজানা নয়—

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥'

সর্ব্বোপরি শ্রীরামচন্দ্রের অমর বাণী, এসো, আমরা স্মরণকরি—

—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

ওরে, আজ ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সেই পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি অন্তর্হিত! তাই না দেশ অধঃপতিত, কোথায় সে গুরু-জনে ভক্তি?—সে দেশপ্রেম ও ন্যায় নিষ্ঠা কোথায়? তাই আজ জন-সমাজে সত্যনিষ্ঠ আদর্শ সন্ন্যাসী ও আদর্শ সংসারী বিরল। ধর্ম্মাচরণে প্রতিবদ্ধ হলেই শুধু ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ন্যায়

পিতৃ-মাতৃ-আজ্ঞা সবিনয়ে লঙ্ঘনীয়। পিতৃঋণ উপেক্ষায় প্রত্যবায় জন্মে।

এইবার বৎস, শোন। আমি কিছুই ভাঙতে আসিনি, গড়তেই শুধু এসেছি। গড়ার সাথে সাথেই অলক্ষ্যে অসার যা, তা ধীরে ধীরে ধ্বসে পড়বে। বর্ত্তমান শ্রদ্ধাহীন উচ্ছৃঙ্খল জগতের জীবন-বেদ আমি এমনভাবে এমনই একটা জ্বলন্ত সুশৃঙ্খল জীবন দৃষ্টান্ত দ্বারা গড়ে তুলতে চাই তোমার মাধ্যমে যে তোমার সাধনোত্তর আচরণে সন্ন্যাস ও সংসার অভিনব সমন্বয়ে বিধৃত হয়ে থাকবে। সন্ন্যাসীর কর্ম্ম সংন্যাস ও গৃহীর কর্ম্মসাধনায় জ্ঞান ও ভক্তির ঐক্যসূত্রটি যে যোগ-সামঞ্জস্যের মহিমায় গ্রথিত হয়ে আছে, ঐহিক দুর্গতির চরম সীমায় লোক শিক্ষার্থে ও সমাজ শৃঙ্খলায় তার দৃষ্টান্তিক প্রবর্ত্তন আজ সর্ব্বাধিক।

তোমার প্রাক্তনই তোমাকে এই ব্রতের সুষ্ঠু অধিকারী করেছে। তাই সন্ন্যাস গ্রহণকালে যদিও তোমাকে তোমার বিগত জীবনের শ্রাদ্ধ-শান্তি-ক্রিয়া সম্পন্ন করে নিতে হবে, তবু বলছি শোন, তোমার স্থূলদেহের জনক-জননী তোমার সন্ন্যাস জীবন সাধনায় বিন্দুমাত্র অন্তরায় হবেন না। তারপর, সত্যসাধনায় পূর্ণসিদ্ধি লাভের পর পূর্ণদীপ্তি নিয়ে সর্ব্বভূতেহিতেরত তুমি,—'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখাও,'—নিত্য-মুক্ত-স্বভাববান তুমি,—লোক সমাজে বিচরণ কর, সত্য-ধর্ম্ম প্রচার কর।

বলো তুমি—'পিতৃদেবায় নমাম্যহং,
মাতৃদেব্যৈঃ নমাম্যহং।'

—আমি ভক্তিভরে গুরু সমীপে পিতৃ-মাতৃ প্রণাম-মন্ত্র উচ্চারণ করলাম।"

শ্রীশ্রীঠাকুর দাদাগুরুর এবম্বিধ অনুশাসন বাণী আমাদিগকে শুনাইয়া পরে সংক্ষেপে সকল কথার সারমর্ম্মরূপে বলিলেন—

"ওরে, সন্ন্যাসী মন নিয়ে থাকা সংসারী বন্ গে।

'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ, তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।

যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্বীত, তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥'

—গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তা ব্রহ্মেতে সমর্পণ করবেন।

এই শেষ কথাটি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখবে—"তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।" জীবনের লক্ষ্য এই একম্, অন্য সব উপলক্ষ মাত্র। এই পরম সত্যই জীবনের চরম সার কথা। তাই না, আমাদের আশ্রমবাণী—

'ওঁ সত্যমেব জয়তে ধ্রুবম্।'

সতত স্মরণে রাখবে—আমাদের আশ্রমবাণী শক্তি সার্থকতারই বাণী। একমাত্র সত্যই সকল দুর্গতি হরণ করে। তাই আমাদের সাধন-বাণী—

"গো-গঙ্গা-গুরু-গীতা-গায়ত্রী-গণেশ-গর্ভধারিণী

সপ্তগা সাধনা মাতঃ—ত্বংহি দুর্গা দুর্গতিহারিণী॥"

*　　*　　*

ইহার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের আগামী কল্য রওনা হইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তখন আমরা সকলেই তাঁহার কি কি আজ্ঞা বা আদেশ নির্দ্দেশ হয়—ইহা শুনিতে লাগিলাম। তাঁহার

আজ্ঞা বা আদেশ প্রতিপালন করিবার মত ক্ষমতা আমাদের কাহারও নাই। তথাপি শুধু শোনা ছাড়া অন্য উপায়ও নাই। যাহা হউক, ব্যবস্থাগুলি বলি।

প্রথম ব্যবস্থা দিলেন, গুরুগম্ভীরস্বরে সকলের উপর কঠোর নির্দ্দেশ—"আমি এখানে থাকতে তোমরা যাব যা-খুশী করতে পার, কিন্তু অন্যত্র গেলে তোমরা অতি সাবধানে থাকবে। কোনরূপ নীতি-বহির্ভূত কর্ম্ম যেন তোমাদের দ্বারা না হয়। এমন কোন কাজ করবে না যাতে পরে আমায় অশান্তি ভোগ করতে হয়।"

দ্বিতীয় নির্দ্দেশ—"সর্ব্বদা দেখবে আশ্রমের একটি পশু-পক্ষীও যেন দুঃখ না পায়, কষ্ট বোধ না করে।"

আরও বলিলেন পণ্ডিত কালীপদকে দেখাইয়া—"আমি যে ক'দিন আশ্রমে না ফিরি সেই ক'দিনের সমস্ত দায়িত্ব কালীপদ'র উপর ন্যস্ত রইল। ও যা' বলবে এবং যেরূপ ব্যবস্থা দেবে তোমরা সকলেই বিনা বিচারে তা' মাথা পেতে মেনে নেবে। ওর আদেশ বা ব্যবস্থা আমার আদেশ বা ব্যবস্থা বলে মেনে নেবে। দেখবে যেন এর অন্যথা না হয়।"

তারাপদ'র দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি ভোগ, পূজা, আরতি নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করবে। এর যেন অন্যথা না হয়।" তারাপদ বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, আমি তাই করব। যাতে কোনরূপ আশ্রমের নিয়ম বহির্ভূত কর্ম্ম না হয়, আমার সাধ্যমত তারই চেষ্টা করব।"

এই কথা শেষ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমাদের রাধাগোবিন্দকে সাথে নিয়ে গেলে কেমন হয়?" বলিলাম, "অতি উত্তমই হয়। আমি ভয়ে বলি নাই। যখন আপনি পূর্ব্বে ওর যাবার বিষয় কিছুই বলেন নাই—আমি ভেবেছিলাম মোটরে স্থানাভাব হবে, সেই জন্যেই আপনি একথা বলেন নাই।" তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, 'না, না, জায়গা ঠিকই হবে, সে যেমন করেই হোক যাওয়া যাবে। তবে কথা হচ্ছে, আশ্রমে কে ভোগ রাঁধবে? এতগুলি সন্তান এখানে রইল, এদেরও ত' দেখতে হবে।" ইহা শুনিয়া সকল গুরু-ভ্রাতা ও ভগিনীগণ প্রায় এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "না, না, আমাদের কোনরূপ কষ্ট হবে না আমরা সকলে মিলে সব করে নেব। এর জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। ওকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান নচেৎ ঠাকুরমার বড় কষ্ট হবে। এতদিন পরে আপনি যাচ্ছেন, আপনার কাছে তিনি একটুও থাকতে পাবেন না। কারণ, আপনি ত' একলা যাচ্ছেন না—এত জন সন্তান সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন।" ইহা শুনিয়া তিনি. বলিলেন, "বেশ, তা হলে রাধাগোবিন্দ চলুক।"

হঠাৎ শুনি কে একজন দৌড়াইয়া ও লাফাইয়া আনন্দ জানাইতেছে। চাহিয়া দেখি, রাধাগোবিন্দ। ইহার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে তাহার মুখখানা যেন ছিল কালি ঢালা। এক্ষণে সেখানে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। ভাবিলাম, সামান্য পাচক ব্রাহ্মণ—

ইহার ভিতরও কী সুন্দর প্রেমের বীজ শ্রীশ্রীঠাকুব ধীরে ধীরে কোন্ অজানা মুহূর্ত্তে রোপণ করিয়া দিয়াছেন।

যাক্, তারপর আর এক পালা। ঠাকুরের পালঙ্কের একটি পাশে দাঁড়াইয়া পাষাণ প্রতিমার মতন আমাদের ভক্তিমতী হিরণ-মা—দুইটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। তাঁহারই পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার কন্যা বাণী। তাঁহার দু'চক্ষে ঝর-ঝর ধারায় অশ্রু যেন তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে। ভক্ত বৎসল হঠাৎ সেই দিকে দৃষ্টি দিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে মা, কেন অমন করে আছ? কি ভাবছ মা? ওরকম করে থেকো না। যতটুকু সময় আমার কাছে আছ শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অন্তরের অন্তঃস্থল প্রেমাপ্লুত করে নাও। কেন যাবার আগেই এরূপ কষ্ট করে থেকে থাকার আনন্দটুকুও নষ্ট করছ। যতটুকু সঙ্গ পাও সে সঙ্গ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা কর। বরাবরই ত তোমাদের বলেছি, এ রকম মন খারাপ ক'রে মুখখানা কালি ক'রে যাবার আগে আমার সামনে কেউ দাঁড়াবে না। আমারও কি কষ্ট হয় না মা তোমাদের ছেড়ে থাকতে? আমার প্রাণটা কি চায় তোমাদের দূরে রাখতে? কিন্তু উপায় নেই, কি করব বল? যার যতটুকু কাজ তাকে তা করতেই হবে। তোমাকে বেশীদিন আর এ কষ্ট পেতে হবে না।" এই কথা বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে আপনার কাছে ডাকিয়া মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিলেন।

আমরা এ দৃশ্য দেখিয়া চিন্তা করিলাম—"কী দুরন্ত কর্ম্ম জীবের! হা ভগবান্! এ কি বাঁধন,—কি নাগপাশেই না বেঁধেছেন,

দেবতা! যে বাঁধন—সে যে শত চেষ্টায়ও জীব খুলতে পারে না! দিন ঠাকুর, ধীরে ধীরে এমনি করে দিন, এই রকম করুন যেমন আপনি হিরন্ময়ী মায়ের মস্তকোপরি আপনার পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিয়ে জ্ঞান-দীপ উদ্‌ঘাটিত ক'রে প্রজ্জ্বলিত ক'রে দিচ্ছেন। দিন ঠাকুর সত্য সত্য,—তেমনি ধারায় আমাদের ফুটিয়ে তুলুন, জাগিয়ে তুলুন, জ্বালিয়ে ধরুন—দেখতে দিন, বুঝতে দিন—আমাদের নাগপাশ মোচন করুন।"

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এই চিন্তা করিতেছিলাম—কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন, "আজ রাত্রি চারটের সময় সকলে উঠবে। যে আগে উঠবে সে আর সকলকে জাগিয়ে দেবে। সাড়ে পাঁচটায় মোটর আসতে বলেছি—বাবুলাল ড্রাইভার আজ বিকালে এসে সব ঠিক করে গেছে। তোমরা সামান্য কিছু ভোগের ব্যবস্থা সঙ্গে রাখবে। কারণ, আমাদের পৌঁছাতে বিকাল পাঁচটা হয়ে যাবে।" সকলেই বলিলাম—"সে সকল ব্যবস্থা পূর্ব্ব হতেই কিছু কিছু করে রাখা হয়েছে।"

ইহার পর ঠাকুর আরও বলিলেন,—"আমাদের বেরুবার পূর্ব্বেই প্রতুল, তুমি হিরন্ময়ী-মাকে সাথে নিয়ে রওনা হবে এবং শনিবার দিনই আশ্রমে ফিরে আসবে।" ইহা শুনিয়া কালীপদ বলিলেন —"প্রতুলকুমারের ইচ্ছা, আর দু'একদিন সাতগেছে থেকে সেই স্থান দেখে আসে। ভয়ে আপনাকে বলতে পাচ্ছে না। আপনি যদি আদেশ করেন, তা'হলে একদিন আরও থেকে আসবে।" ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "বেশ, তাই হবে।"

মাতৃহীন আশ্রম-বালক-ভৃত্য ভাতুয়াকে ডাকিয়া বলিলেন, "যে দু'দিন আমি থাকব না, তুমি কোনরূপ গোলমাল করবে না এবং ইতিমধ্যে তোমার বাড়ীতে দেখা করে আসবে, পরে আমাদের সাথে বাংলা দেশে যাবে।" ইহা শুনিয়া তাহাব খুব বেশী আনন্দ হইল বলিয়া মনে হইল না। কারণ, বাড়ী যাইবার জন্য যত ব্যস্তই হউক না কেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িতে সে নারাজ। মুখখানি ভাব করিয়া বলিল,—"আচ্ছা।" গোপনে চোখ দু'টি মুছিয়া পলাইয়া গেল।

তাহার পর মুরলীমোহনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, তুমি প্রয়োজন মত "ফার্ষ্ট-এইড্-এর (প্রাথমিক চিকিৎসার) সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়েছ ত'? হঠাৎ হয়ত প্রয়োজন হতে পারে।" মুরলীমোহন সম্মতি-সূচক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, সমস্তই কিছু কিছু নিয়েছি।"

তারপর ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি রাত্রি এগারটা হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "এইবার মশারি ফেলে দাও। সকলে ওঠ। শোবার ব্যবস্থা কর, কাল আবার ভোরে উঠতে হবে।" এই কথা শুনিয়া আমরা সকলেই উঠিয়া পড়িলাম এবং শ্রীচরণ-ধূলি মস্তকোপরি লইয়া একে একে সকলেই নিজ নিজ শয্যার দিকে গমন করিলাম।

শুইবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুর যাহার উপর যে কার্য্যের ভার আছে বা যাহার উপর যেরূপ আদেশ আছে, সেগুলি পরিদর্শন কার্য্য সারিয়া শুইতে গেলেন, যথা—আশ্রম বাড়ীর সকল দ্বার বন্ধ

করা, বাহিরে কোনরূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পড়িয়া আছে কিনা দেখা, সকলে পানীয় জল পাইল কিনা, সকলের শয্যার ঠিক মত ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা, কাহার মশারির প্রয়োজন এবং কেহ অসুস্থ থাকিলে তাহাকে দেখিয়া তাহার আর কোন প্রয়োজন আছে কিনা দেখা—ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালীপদকে মাথার বালিশ ও মশারি লইয়া ঠাকুরের ঘরে শুইবার জন্য ডাকিলেন। বুঝিলাম, ঠাকুরের আজ আর শুইবার ইচ্ছা নাই। আগামী কল্য সকালে যাইতে হইবে, সেইজন্য তিনি সুব্যবস্থা করিবার ইচ্ছায় অদ্য রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দিবেন। তাই কালীপদ'র ডাক পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমরা গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলাম।

*　　　*　　　*

৯ই জুন, শুক্রবার। ব্রাহ্মমুহূর্তে কালীপদ'র ডাকে সকলের ঘুম ভাঙ্গিল। কালীপদ হাঁকিতেছেন, "চারটা কুড়ি হয়ে গেল, সবাই উঠে পড়ুন।" সঙ্গে সঙ্গে সকলে উঠিয়া পড়িলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর বহু পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। স্নানান্তে তিনি শয়ন গৃহের একধারে রাখা কেদারাখানিতে উপবেশন করিলেন। ঠাকুর চা পান করিলে আমরাও একে একে প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। ইহার পর হুড়াহুড়ি, ছুটাছুটি লাগিল। এটা তোলো, ওটা বাঁধো, ইহা লইয়াছ কি—উহা গুছাইয়া দাও, ইত্যাদি।

যাহা হউক, সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় দুইখানি সাইকেল-রিক্সা করিয়া হিরন্ময়ী-মা ও বাণী প্রতুলকুমারকে সঙ্গে লইয়া শ্রীচরণে বিদায় গ্রহণান্তে দর দর ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে সাতগাছিয়া উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। আশ্রমের এই বিদায়-দৃশ্যটি কি মধুমাখা! কি বেদনাদায়ক! যাঁহারা বিদায় নেন, তাঁহারা ত' চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে আশ্রম সীমানা ত্যাগ করেন-ই, আর যাঁহারা তাঁহাদের বিদায় দিবার জন্য উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদেরও প্রত্যেকের মুখ বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং নয়ন পল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে।...



গিরিডির পথে

এইবার আমাদের যাইবার পালা।

দেখা গেল, বাবুলালের সুবৃহৎ হাডসন-গাড়ীখানি ধীরে ধীরে আশ্রম প্রাঙ্গণে উপনীত হইল—শ্রীশ্রীঠাকুরকে বুকে লইয়া তাঁহার পিতামাতার স্নেহময় ক্রোড়ে তুলিয়া দিতে। কত সৌভাগ্য আজ বাবুলালের যে, সে আজ পার্থ-সারথীর সারথী! ধন্য বাবুলাল।

এইবার ঠাকুরের আশ্রম ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার সময় প্রায় আসিয়া গেল। একে একে আমরা সকলে মিলিয়া মাল-পত্রগুলি আশ্রম-প্রাঙ্গণের বাহির করিলাম এবং যেটি যেখানে রাখিলে ভাল ভাবে থাকে ও আরোহীগণের কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেইভাবে একটি একটি করিয়া গাড়ীতে সাজাইয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া তদারক করিয়া এ সকল ব্যবস্থা করিলেন। পরে একে একে আশ্রমের বালক বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত নয়নধারা বর্ষণ করিতে করিতে শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন! যাহাকে যে-ভাবে সম্ভাষণ করিলে হৃদয়-মন তৃপ্ত হয়, ঠাকুর তাহাকে সেইভাবেই সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন।

পরে, আশ্রম-বিগ্রহ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ৺মায়ের নিকট বিদায় লইতে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দশ মিনিটকাল অবস্থান করিলেন। আমরা সকলে মন্দিরের বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দ্বার উন্মুক্ত হইল।

দেখিলাম, নয়ন যুগল প্রেমাশ্রুপূর্ণ, গণ্ডদেশ বাহিয়া ধারা নামিতেছে। শ্রীঅঙ্গ মৃদু কম্পমান, দৃষ্টি যেন সুদূর প্রসারী—কোন অজানা রাজ্যে না জানি উধাও!

পরে হঠাৎ যেন জাগিয়া তিনি আমাদিগকে ডাকিলেন,—"চল, চল, শীঘ্র ওঠ।" বলিবা মাত্র আমরা সকলেই একসাথে গাড়ীর দিকে আগাইয়া গেলাম। ঠাকুরও আসিলেন। আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। সঙ্গে চলিয়াছি—মুরলীমোহন, বিভূতিভূষণ, মঞ্জু-মা, আমি, রাধাগোবিন্দ ও বাবুলাল।

বসিয়া গাড়ীর বাঁদিকে চাহিয়া দেখি কালীপদ অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে বলিতেছেন, "বাবা, দুদিনের বেশী যেন দেরি করবেন না।" ডানদিকে চাহিয়া দেখি আশ্রম-প্রাঙ্গণ বিদায়-বেদনায় পূর্ণ, তাহারই মতন ব্যথা ভরা বুকগুলি বুকে লইয়া অপলক নেত্রে চাহিয়া আছে এবং যাঁহাদের বক্ষে ধরিয়া আছে তাঁহারাও পাষাণ প্রাঙ্গণের ন্যায় স্থির হইয়া রহিয়াছেন। তবু কি অশ্রুরাশি বাঁধ মানে? টমি?– সে-ও!

হঠাৎ "জয়গুরু" রবে দিকদিগন্ত নিনাদিত হইল। আশ্রম দামামা বাজিয়া উঠিল। "শ্রীগুরুজী কি জয়"—পর পর ধ্বনিত হইল তিনবার। সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমিও সেই সঙ্গে তালে তালে সবার সুরে সুর মিলাইয়া জয়ধ্বনিতে যোগ দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর আদেশ দিলেন,—"গাড়ী ছাড়ো।"

ধীরে ধীরে মৃদু মন্দ গতিতে জগন্নাথের রথ আশ্রম প্রাঙ্গণ ছাড়াইয়া বড় রাস্তায় বাহির হইল। পিছন দিকে চাহিয়া দেখি, আশ্রম-প্রাঙ্গণে প্রতিটি ভক্ত, এমন কি শ্রীগুরু আশ্রমের একান্ত প্রভুভক্ত কুকুরটি—সেটিও, স্থির নেত্রে চাহিয়া আছে—যতদূর তাঁহাদের দৃষ্টি যায়। তখনও গাড়ীর ভিতর ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা সকলেই স্তব্ধ—নিজের নিঃশ্বাস নিজের কানে শুনিতে পাওয়া যায় মাত্র। যখন আর দেখা যায় না, তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আমরা সকলে চোখ ফিরাইয়া লইলাম। এতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর শুধু ইহাদের দেখেনই নাই—অভয় হস্তখানি উর্দ্ধে তুলিয়া ধীরে ধীরে আন্দোলন করিতে করিতে শেষের দিকে স্থির হইয়া রহিলেন।—সকলে নীরব, নির্ব্বাক।

চলিলাম। চলিল রথ—আপনভাবে গতিবিভোর। বুকে তাহার একান্ত আপন জন।...

হঠাৎ পিছন পানে মুখ ফিরাইয়া দেখি—আনন্দময় স্থির-নেত্র। অন্তরে কি যেন এক অস্ফুট ভাষা, চাহিয়া আছেন দূর দিগন্তে।...

ছুটিয়া চলে গাড়ী—দ্রুততর ছন্দে।...

হঠাৎ কানে আসিল মুরলীমোহনের সতর্কবাণী—"বাবুলাল, পঁচিশ-তিরিশের বেশী গাড়ী চালিয়ো না। খুব সাবধানে গাড়ী নিয়ে চল।"

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বলিলেন, "বাবুলাল, এই যে এত গাড়ীতে ধাক্কা-লাগা শোনা যায়, প্রায়ই যে দুর্ঘটনা হয়, এর কারণ আর কিছুই নয়, কতকগুলি বেপরোয়া বাহাদুরীর ফলে অসাবধানতায়

এইসব দুর্ঘটনা ঘটে। লোকে গাড়ীর দোষ দেয়—গাড়ীর কোন দোষ নেই বাবা।. চালক, আরোহী, পথচারী প্রত্যেকে স্ব স্ব স্থানে সাবধান হলেই বিপদ কোনদিনই হতে পারে না।" কথা কয়টি আজ নূতন নহে। যখনই ঠাকুর যে কোন যানবাহনে উঠুন না কেন তিনি এই সাবধানী বাণী বলেন—"সাবধানের মার নেই।"

* * *

শ্রীশ্রীঠাকুব কতবার কত ট্রেন-দুর্ঘটনার পূর্ব্বাহ্ণে সহযাত্রীদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার "ছিক্‌ছথ্‌-ছেন্স" (তীক্ষ্ণধী) এতই প্রখর। দূরদৃষ্টি প্রভাবে তিনি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারেন —গাড়ী লাইন চ্যুত হইয়া নীচে নামিয়া যাইবে।

একবার শ্রীশ্রীঠাকুর লক্ষ্ণৌ হইতে কানপুর যাইতেছেন। পথে তাঁহাব সহযাত্রী ই. আই, রেলওয়ের অডিট ইন্‌স্‌পেক্টর মিঃ চ্যাটার্জ্জিকে তিনি এক সময় বলিলেন—"ট্রেন লাইন চ্যুত হ'য়ে পড়বে সহসা"। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেনখানি লাইন হইতে অকস্মাৎ পড়িয়া যায়।

আর একবার শ্রীশ্রীঠাকুর ঝাঁন্সি হইতে ধোলপুর চলিয়াছেন। দুইটি পাহাড়ের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড বাঁক। গাড়ী পূর্ণবেগে ছুটিয়াছে। সঙ্গে চলিয়াছেন ঝাঁন্সি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও তদীয় পুত্র এবং ঠাকুরের সহোদর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অবনীকুমার। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাদের সতর্ক করিয়া দিলেন—অনতিবিলম্বে এক দুর্ঘটনা ঘটিবে। সচকিত হইয়া সকলে দেখিলেন গাড়ীখানি সশব্দে থামিয়া গেল।

ইঞ্জিনের সামনে লাইনের উপর মস্তবড় একটি মহিষ কাটা পড়িল কিন্তু প্রচণ্ড এক ঝাঁকানি দিয়া গাড়ী সে যাত্রায় রক্ষা পাইল।

আর একবার জসিডি ষ্টেশনে তিন চারিটি গুরুভ্রাতা বর্দ্ধমান উদ্দেশ্যে গাড়ীতে উঠিলে তিনি তাঁহাদের নামাইয়া লন এবং বলেন, "আজআর যেতে হবে না, আশ্রমে ফিরে চল।" কোনদিন কেহ কোথাও গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর ষ্টেশনে পৌঁছাইতে যান না, কিন্তু সেই দিন তিনি কি জানি কি ভাবিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ষ্টেশনে পৌঁছাইলেন এবং টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া তাঁহাদিগকে ভালমত বসাইয়া গাড়ী ছাড়িবার ঘন্টা হইবার পরে বলিলেন —"শীঘ্র তোমরা নেমে পড়।" তাঁহারাও নামিয়া পড়িলেন, ট্রেনও ছাড়িয়া দিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দেখা গেল—'ডিসটাণ্ট সিগন্যাল' (দূরবর্ত্তী সংকেত-চিহ্ন) তখনও পড়ে নাই, সজোরে ট্রেনখানি লাইন হইতে নামিয়া গেল। তখনও প্ল্যাটফরম ছাড়িয়া ঠাকুর বাহিরে আসিতে পারেন নাই। সকলেই অবাক হইয়া দেখিলেন, বিপদবারণ শ্রীগুরু-নারায়ণ চাহিয়া আছেন পথচ্যুত গাড়ীখানির দিকে। পরে মৃদু হাসিয়া ইঁহাদের পানে তাকাইয়া বলিলেন, "দেখলে ত বাবা, বার বারই তোমাদের আজ যেতে বারণ করেছিলাম। তোমরা কিছুতেই কথা শুনলে না। তাই বাধ্য হয়ে নিজেই তোমাদের মতে মত দিয়ে এখান পর্য্যন্ত এসে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা ত' বোঝ না কত বড় দায়িত্ব আমার। জেনে বুঝে কি আর তোমাদের বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে পারি? তা যদি বুঝতে বাবা, কোনদিনই কোন দুঃখ—কোন কষ্ট—কোনরূপ অশান্তির

ছোঁয়াচ তোমাদের দেহমন স্পর্শ করতে পারত না। চল, ফিরে চল।"

... ...

যাক্, আমাদের কথায় ফিরিয়া আসি।

গাড়ীখানি হাজারিবাগ হইতে একুশ মাইল দূরে বাগোদরের প্রায় কাছাকাছি পৌছাইয়াছে। এমন সময় দেখা গেল "লাল কোম্পানীর" বৃহৎ বাসখানি পথ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "এই যে হিরন্ময়ীর বাস"। বলিতে না বলিতেই আমাদের গাড়ীখানি ঐ বাসটির কোলের কাছে পৌছাইল। উপর দিকে চাহিয়া দেখি—হিরন্ময়ীমা, বাণী ও প্রতুল কুমার সহ সতৃষ্ণ নয়নে হাত দুইটি বাড়াইয়া নমস্কার করিতেছেন। আমরা সেস্থানে দাঁড়াইলাম না বটে, কিন্তু তাঁহাদের "জয়গুরু" "জয়গুরু" ধ্বনি আমাদিগকে যেন তাঁহাদের পানে টানিয়া লইল। গাড়ী আগাইয়া চলিল, কিন্তু কি সুন্দর লাগিল মধ্যপথে ছল ছল নয়ন ছ'টির এই গুরু-প্রেম নিবেদন—সব কয়টি চোখ একের দিকে মিলিতেছে—প্রেমাশ্রু অর্ঘ্যরূপে শ্রীগুরুর-চরণে অর্পিত হইতেছে। এই চিন্তায় আমাদের মন বিভোর হইল।.........

অবিরাম গতিতে গাড়ী চলিয়াছে। ঠাকুর এতক্ষণ নিস্তব্ধই ছিলেন। এক্ষণে গাড়ীখানি একটি বাঁকের মুখে আসিয়া পড়িল। তিনিও তৎক্ষণাৎ বাবুলালকে বলিলেন, "বাবুলাল, জিলেবীঘাট এসে গেছে—সাবধানে খুব ধীরে ধীরে হর্ণ দিতে দিতে এগিয়ে

চল।” বাবুলাল সেই মতই চালাইতে লাগিল। প্রায় বাঁক শেষ হইয়াছে এমন সময় একখানি ছোট মোটর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যেন উন্মত্তের মত রাস্তার এধার ওধার করিতে করিতে কোনরূপে আমাদের গাড়ীর সহিত ধাক্কাটি বাঁচাইয়া চলিয়া গেল। গাড়ীতে আমরা যে কয়জন ছিলাম, সকলেই ঐ গাড়ীখানির এই বেসামাল অবস্থা দেখিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ঠাকুর শুধু বলিলেন,—“দেখে ত বাবুলাল, ইয়ে বেকুব লোগ্ এ্যায়সাই মরতা হ্যায়।” আমরা একটি স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলাম—“জয়গুরু” !

ইহার পর গিরিডির পথে আর কোনরূপ নূতন উপসর্গ বা কোন ঘটনা হয় নাই। গাড়ীখানি যথাসময়ে গিরিডি ষ্টেশনে পৌছাইল।

গিরিডিতে

ওয়েটিং রুমের সামনে গাড়ী থামাইয়া বাবুলাল গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। বিভূতিভূষণ নামিয়া পড়িয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকের দরজাটি খুলিয়া দিলেন। তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন। গাড়ী হইতে নামাইলাম শুধু আশ্রম হইতে আনীত মিষ্টান্ন। ঠাকুরের আদেশে রাধাগোবিন্দ নিকটস্থ চায়ের দোকান হইতে জল গরম করিয়া নিজ হস্তে চা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্য লইয়া আসিল। ঠাকুরের চা ও আনুষঙ্গিক গ্রহণের পর আমরা সকলে প্রসাদ পাইলাম।

এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,—"একটা কাজ করা যাক্। এখনও মধুপুরের গাড়ী ছাড়তে তিন ঘণ্টা দেরি আছে। চল, কাছেই একখানা বাড়ী আছে আমার পরিচিত। সেখানে স্নান সেরে খাওয়া-দাওয়া করে আবার ফিরে আসা যাবে। এখানে এই অপরিষ্কারের মধ্যে স্নানাহার না করাই ভাল।" আমরা সকলেই একমত হইলাম কারণ আমাদের প্রয়োজন শ্রীশ্রীঠাকুরকে এবং তাঁহার তৃপ্তিতেই আমাদের তৃপ্তি।

তৎক্ষণাৎ সকলে মিলিয়া আবার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী চলিল পূর্ব্বোক্ত বাড়ীখানির উদ্দেশ্যে। আমরা কেহই জানি না গাড়ী যাইয়া কোথায় থামিবে। হঠাৎ গাড়ী এক

সুবৃহৎ মহুয়া বৃক্ষতলে থামিয়া গেল শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে। দেখিলাম, বাটীর গাত্রে লেখা রহিয়াছে—"কিরণ কুটীর"। যাহা হউক, একে একে সকলে নামিয়া "কিরণ কুটীরের" অঙ্গনে পৌছাইবার পূর্ব্বেই ঠাকুর "বুধন"—"বুধন" করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই বাড়ীর মালীকে ডাকিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া পাশের বাড়ী হইতে এক বৃদ্ধ ঠাকুরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, "দরওয়াজা খোল। নাহানেকা পানি লাগাও।" মালী তৎক্ষণাৎ গৃহ দ্বারের চাবি খুলিয়া আমাদের সকলের ভিতরে যাইবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল।

দেখিলাম, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া এই ছোট বাড়ীটি মালী রাখিয়াছে। বাড়ীর মালিক কলিকাতায় আছেন। উপস্থিত মালীর তদারকেই এই বাড়ীখানি রহিয়াছে।

মালী ঠাকুরের কথা মত স্নানের জল স্নানাগারে আনিয়া দিল। যেমন যাহা প্রয়োজন আমরা শ্রীহস্তে তুলিয়া দিলাম। ইতিমধ্যে গৃহখানির অল্প স্থান মুছিয়া আসন পাতা হইল এবং ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা হইল। সঙ্গে আনীত আশ্রমে প্রস্তুত লুচি, আলু পটলের ব্যঞ্জন, সামান্য মিষ্টি ও আম দিয়া ভোগ সাজাইয়া আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের গ্রহণের অপেক্ষা করিতেছি এবং মঞ্জুমা দাঁড়াইয়া যাহাতে মাছি না বসে সেজন্য পাখার বাতাস দিতেছেন।

ঠাকুর আসিয়া আমার গাত্র-চাদরখানি আসনরূপে পাতা দেখিয়া বলিলেন, "একি, এটা তুলে নাও, এর উপর বসব না।" বলিলাম, "আপনি বসুন, এতে চাদর ময়লা হবে না।" ঠাকুর

নিরুপায় হইয়াই যেন শ্রীচরণদ্বয় মাটিতে রাখিয়া এক পাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভোগ নিবেদনান্তে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

আচমনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর বাবুলালকে প্রসাদ দিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহার খাবার কিনে দেবার কথা ছিল, প্রসাদ কুলোবে ত?" আমরা সকলে বলিলাম, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কুলাবে। যা আছে বাবুলাল খেয়েও আর একজন খেতে পাবে।" ইহা শুনিয়া ঠাকুর অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং বলিলেন, "ভালই হয়েছে, তোমরা বস, আমি বাবুলালকে দিচ্ছি।" এই বলিয়া ঠাকুর নিজ হস্তে বাবুলালকে সযত্নে প্রসাদ দিয়া আসিলেন। শুনিতে পাইলাম তিনি তাহাকে বলিতেছিলেন, "পেটভরকে খা লেও, আউর জরুরত হোনে সে বোলো।"

ইতিমধ্যে আমাদের সকলেরই প্রসাদ পাওয়া হইয়া গিয়াছে। তখন আরও একজনের মত লুচি পড়িয়া রহিয়াছে। এইবার পূর্ব্বোক্ত সেই মালীর ডাক পড়িল। ঠাকুর তাহাকেও নিজ হস্তে তুলিয়া প্রসাদ দিলেন। কি আশ্চর্য্য! কোথা হইতে এত বেশী প্রসাদ হইল ইহা আমরা কেহই হিসাবে পাইলাম না। যে কয়টি প্রাণী আমরা "কিরণ কুটীরে" উপস্থিত ছিলাম সকলেই সেদিন ভরপুর প্রসাদ গ্রহণ করিলাম।

পূর্ব্বে কথা ছিল গাড়ীচালকের খাবার কিনিয়া দেওয়া হইবে, কারণ অত সকালে অধিক খাবার করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু

দেখা গেল, যাঁহার প্রসাদ ভাগ্যে থাকে কাহারও সাধ্য নাই সেই প্রসাদ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করে। ভক্তবৎসল নিজ হস্তে তাঁহার মুখে প্রসাদ তুলিয়া ধরেন। তাই তাঁহারই ইচ্ছায় এই প্রসাদ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। দ্বিগুণ বলিলাম কেন? যাহা প্রস্তুত করিয়া আনা হইয়াছিল তাহা আমাদের পাঁচজনের উপযোগী হইলেও একজন বিহারী ড্রাইভার বা মালী একাই তাহা উদরস্থ করিতে পারে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বিহারী হইয়াও সেদিন এই দুইজন আমাদের মতনই আহার করিল—যাহা তাহাদের জল পানেরও ন্যূন।

এরপর পাশের ঘরে চাহিয়া দেখি,—মহর্ষি সত্যদেব ঠাকুরের একখানি প্রতিকৃতি রহিয়াছে। বিভূতিভূষণ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর রাধাগোবিন্দের নিকট হইতে একটি ছোট কাঠপেন্সিল আদায় করিয়া লইয়া ঐ ফটোখানির তলদেশে দেওয়ালে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই স্থানে আগমন—অবস্থান—নির্গমন এবং আমরা কে কে সঙ্গে আসিয়াছি, পরিষ্কার অক্ষরে লিখিলেন। ঠাকুর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "মঞ্জু, পড়ত, বাঁদরটা কি লিখে এল।" মঞ্জু-মা ঐ কক্ষে প্রবেশ করিয়া জোরে জোরে পড়িয়া ঠাকুরকে সব শুনাইলেন। শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হাসিলেন।...

———

দেওঘরের পথে

এইবার আমাদেব ষ্টেশনে যাইবার সময় হইল। ঠাকুর আদেশ করিলেন, "চল, সকলে জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও, আর দেরি করো না।" আমরাও যেখানে যাহা কিছু পড়িয়াছিল সমস্ত গুছাইয়া বাঁধিয়া মোটরে তুলিয়া দিলাম। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ও আমরা সকলে একে একে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে গাড়ী গিরিডি ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইল এবং দশ মিনিটের মধ্যে ষ্টেশনে আমাদিগকে পৌছাইয়া দিল।

এখানে বলিয়া রাখি যে, শ্রীশ্রীঠাকুর ৺বৈদ্যনাথধাম হইতে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত গিরিডি ডাকবাংলায় বাবুলালকে গাড়ী সহ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক ছিল। যাক্, আমরা সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া অপেক্ষমান ট্রেনের একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরার নিকট উপস্থিত হইলাম। মালপত্রগুলি কুলির দ্বারা কামরাখানির মধ্যে উঠাইয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর বলিলেন, "বিভূতি, তুমি চট্ করে টিকিটগুলি করে নিয়ে এস। মুরলী, ওকে টাকা দিয়ে দাও।" বিভূতিভূষণ টাকা লইয়া দ্রুত বুকিং অফিসে প্রবেশ করিলেন ও সত্বর টিকিট কিনিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন সকলেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছেন

তখন বেলা এগারটা। বুঝিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ আজও যথাসময়েই হইয়াছে। আমরা সকলে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে আমাদের গাড়ীখানি গিরিডি ষ্টেশন ছাড়িয়া মধুপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। গাড়ীর গতি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।...

ঠাকুর জানালার ধারে বসিয়া দূর-দিগন্তে চাহিয়া রহিয়াছেন। আমরা সকলে নানারূপ আলোচনা ও হাস্য কলরবে গাড়ীখানি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "বিভূতি, বল্ ত' গাড়ীখানি কি বলছে ?

বিভূতিভূষণ বলিলেন, "গাড়ী বলছে—যাচ্ছি যাবো, যাচ্ছি যাবো, যাচ্ছি যাবো।"

ঠাকুর বলিলেন, ঠিক বলেছিস্ রে, ঠিক বলেছিস্। তোদের ভেতর দিকে কানটা দে দিকিনি,দেখ, শুনতে পাবি সেখানেও এরূপ শব্দ—ধ্বনি হচ্ছে—যাচ্ছি যাবো, যাচ্ছি যাবো, যাচ্ছি যাবো। শোন, আরও একটু পরিষ্কার ক'রে বলি। দেখ, এই গাড়ীর ড্রাইভার যখন ধীরে ধীরে গতি সুরু করে নিয়ে নিজ লক্ষ্যাভিমুখে গতি স্থির করলো, তখনই তার বুকে একটা সঙ্কল্প জাগলো—যাবো আমি, যেতে হবে। তাই শীর্ষ স্থানে আসীন সারথী ইঞ্জিনের ড্রাইভার যেমন গাড়ীটাকে ঠিক রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গাড়ীটির গতি পথ স্থির করে, গতি বৃদ্ধি করে, চুপটি করে বসে লক্ষ্য করতে থাকে এর গতি প্রগতি—তদ্রূপ আমাদের এই দেহরূপ গাড়ীখানিও যখন

এর মধ্যে যাত্রীকে ধরলো—এই যাত্রী হচ্ছে আমাদের মন এবং ইঞ্জিনের ড্রাইভারের মতন যখন আমাদের শিরোস্থিত শ্রীগুরু সারথীরূপে সেখানে বসে আমাদের গতি সুরু করে দিয়ে লক্ষ্য ও গতি—পথ স্থির করে দেন, প্রগতির নাদ—ধ্বনি তখন মুহুর্মুহু নিনাদিত হতে থাকে পথে পথে, পদে পদে—যাচ্ছি যাবো, যাচ্ছি যাবো। অনন্তের পথে অমৃতত্বে, ওরে—'চলিয়াছি মোরা যাত্রীদল—'চরৈ বেতি, চরৈ বেতি।' প্রকৃষ্টরূপে চল্লেই সত্যযুগ সৃষ্টি হয়, হতাশায় শুয়ে পড়লেই ঘোর কলি, আশায় বুক বেঁধে উঠে বসলেই দ্বাপর, দাঁড়িয়েছো তো ত্রেতা।"

এইবার ঠাকুর আমাদের সকলকে বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে বলিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এক এক করে বল, তোমরা কে কি দেখছ ?"

বিভূতিভূষণ ও অন্যান্য সকলে বলিলেন, "গাছ পালা ইত্যাদি যেন আমাদেব সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।"

আমি বলিলাম, "ঠিক তাই কি ? আমার মনে হচ্ছে—ওরা কেউ আমাদের সঙ্গে চলছে না। আমরাই চলেছি, ওরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠাকুর বলিলেন, "এই দেখ, তোমরা উভয়েই ঠিক বলেছ। কিন্তু একটু, আর একটু বুদ্ধিটাকে স্থির করলেই বুঝতে পাবে যে তোমাদের মন যখন সাধন পথে অগ্রসর হয়ে চলে—তখন প্রথমে মনে হয় বটে যে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই চলেছে।" এ ভাবা এক পক্ষে ঠিকই। দেখ, তোমরা যত অগ্রসর হতে থাকবে

এবং তোমাদের মন যে ভাবধারার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে, সেই সেই ভাবস্থানে তোমাদের চিন্তার বিষয়বস্তুগুলি স্থূল অবয়বগুলি পড়ে থাকে, কিন্তু সেই ধারাটি তোমাদের সঙ্গে চলে না। পরে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পাবে. ঐ বহুমুখীন ধারাগুলি বহু মুখে মিলিয়ে গেছে। যখনই দেখবে, বুঝবে ঐ বহুমুখীন ধাবা, চিন্তার ধারাগুলি একমুখীন হচ্ছে যা এতদিন বহুত্বের আকারে তোমাদের মনের মধ্যে ভিড় করেছিল, তারা সব মিলে এক হয়ে যাচ্ছে. তখনই দেখবে তোমাদের ঐ 'যাচ্ছি-যাবো' শব্দ ক্ষীণ হয়ে যায় এবং গতিবেগও ধীর-মন্থর অথচ দৃঢ় হয়।"

হঠাৎ মঞ্জু-মা বলিয়া উঠিলেন, "ঐ ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগ্‌ন্যাল দেখা যাচ্ছে আমরা পৌঁছে গেলাম।"

ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন. 'ঠিক রে ঠিক। ঐ দেখ. তোদের ঠাকুরও বলছেন, "ঐ ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগ্‌ন্যাল দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ তোমাদের বহুমুখীন গতি একমুখীন হওয়াই একমাত্র সিগ্‌ন্যাল বা সঙ্কেত-চিহ্ন। কাজেই তোমরা যে তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছবেই তা' স্থির করে দেয় ঐ ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগ্‌ন্যাল। অর্থাৎ বহুত্বের নাশ, একত্বের বিকাশ।"

আমরা যেন কোন এক ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয়ে রহিয়াছি। যাক্, আমাদের আলোচনা ক্রমে ঘুরিয়া গেল অন্য দিকে। হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর সকলের সহিত রহস্যাদি করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। এখানে একটু বলি—ঠাকুর যখনই কোন একটি গভীর বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করেন ও উপদেশ দেন,

সেই সময় যাঁহারা সম্মুখে বসিয়া আলোচনা শ্রবণ করেন ও গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মনোভাব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠে। তাই ঠাকুর ঠিক সেই সময়েই এমন একটি রহস্য করেন যে, ঐ গভীর ভাবটি খুবই সহজ হইয়া যায়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

দেড ঘণ্টা পরে গাড়ীখানি মধুপুর ষ্টেশনে পৌছাইল। আমরা সকলে প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে গিয়া উঠিলাম। মালপত্রগুলি সমস্ত সেস্থানে উঠানো হইল। ইতিমধ্যে ঠাকুর হঠাৎ উঠিয়া গিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া আবার আসিলেন এবং বলিলেন, "বিভূতি, আমাদের গাড়ী আসবার প্রায় এক ঘণ্টা দেরি আছে। এখন দেড়টা বেজেছে, তুমি রাধাগোবিন্দকে সাথে নিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে মধুপুর হাট থেকে কিছু হাট করে নিয়ে এস। খুব সম্ভব আজ হাটবার—সোমবার ও শুক্রবার এখানে হাট বসে। কিছু কিনে আনা দরকার। কারণ এরা পূর্ব্বে সংবাদ দিতে দেয় নাই—আমি আজ এতজন সন্তান সহ ৺বৈদ্যনাথধাম পৌছাব। কিছু না নিয়ে গেলে তাঁরা খুবই অসুবিধায় পড়বেন।" বিভূতিভূষণ আর কালবিলম্ব না করিয়া মুরলী-মোহনের কাছ হইতে কুড়িটি টাকা চাহিয়া লইলেন ও রাধা-গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া মধুপুর হাটে একখানি টাঙ্গা করিয়া চলিয়া গেলেন এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে কিছু পটল, আলু ইত্যাদি ও কিছু ল্যাংড়া আম কিনিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলেন। সকলের চা-পান শেষ হইয়াছে, এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিলেন আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীসরোজকুমার মজুমদার।

আসিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুরের পদপ্রান্তে মাথার টুপিটি খুলিয়া রাখিয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এইমাত্র আমি আপনার কথা বলছিলাম। আমি আসছি, একটু আগে একটি ভদ্রলোক আমায় বললেন যে আমাকে একজন সাধু খুঁজছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম,—"তিনি কি হাজারিবাগের সাধুবাবা? তাতে তিনি কোন সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না। যাইহোক, আশ্চর্য্যভাবে আপনার দর্শন পেলাম।"

ট্রেন আসিবার সময় হইয়া গেল—প্রথম ঘণ্টা কানে আসিয়া বাজিল। সরোজকুমার ঐ ষ্টেশনে কাজ করেন। তিনি আমাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া ট্রেনের নিকট গেলেন ও একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমাদের বসাইয়া মালপত্র গুছাইয়া দিলেন। তারপর শ্রীপদধূলি শিরে লইয়া সরোজকুমার ট্রেন হইতে নামিলেন এবং আমাদের ট্রেনও সশব্দে জসিডি অভিমুখে রওনা হইল। আমরা সকলে "৺বাবা বৈদ্যনাথ কী জয়" উচ্চৈঃস্বরে তিনবার উচ্চারণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নানারূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে সাড়ে তিনটা আন্দাজ জসিডি ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছাইলাম। ষ্টেশনে খুব অল্পক্ষণ গাড়ী থামে, কাজেই খুব তৎপরতার সহিত সকলে নামিলাম ও মালপত্র নামাইবার ব্যবস্থা করিলাম। ষ্টেশনে নামিতেই গুরুভ্রাতা শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ পালের সহিত দেখা হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া খুবই আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে পোল পার হইয়া মোটর ষ্ট্যাণ্ড পর্য্যন্ত পৌঁছাইলেন। আমরাও মালপত্র সমেত

ঠাকুরের সঙ্গেই উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সেখানে আসিয়া দেখি আশ্চর্য্যের বিষয়! যেখানে প্রত্যিদিনই তুই তিনখানি ট্যাক্সি থাকে, আজ একখানিও সেখানে নাই। এই অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "বিভূতি, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখ যদি তুবে বাড়ীতে থাকে বা তার ট্যাক্সিখানি থাকে, তা'হলে ডেকে আন।" বিভূতিভূষণ আজ্ঞা মাত্র সেই উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। সেখানে গিয়া তুবের দেখা না পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। দূর হইতেই বিভূতিভূষণকে দেখিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, দেখা হল না?" বিভূতি ভূষণ বলিলেন, 'না।"

আমরাই আমাদের সংবাদ দিয়া ৺বৈদ্যনাথে তার করিতে দিই নাই। ভাবিয়াছিলাম—হঠাৎ পৌঁছাইলে আমাদের দেখিয়া ঠাকুরের বৃদ্ধ পিতামাতা ও ভাই ভগ্নীগণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবেন এখন দেখিতেছি—তার পাইলে তুবের গাড়ীখানি হয়ত আমরা নামা মাত্রই দেখিতে পাইতাম।

যাহা হউক, আমরা ৺বৈদ্যনাথধামের ট্রেনে উঠিয়া বসিলাম। ট্রেন ছাড়িবার আর অধিক বিলম্ব নাই। মুরলীমোহন তখনও পর্য্যন্ত টিকিট কাটিয়া পৌঁছাইতে পারেন নাই। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই মুরলীমোহন ফিরিলেন এবং ট্রেনখানি আমাদিগকে লইয়া ৺বৈদ্যনাথধামের উদ্দেশ্যে রওনা হইল।

আমাদের গাড়ীখানির ভিতর এখন আর আমরা একেলা ছিলাম না, আরও কয়েকটি যাত্রী বসিয়াছিলেন। সুতরাং

আমাদের নিজেদের মধ্যে সে সময় আর বিশেষ কোন আলোচনা হইবার সুযোগ হইল না। আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম---আজ যদি তুবের ট্যাক্সিখানি জসিডি ষ্টেশনে পাওয়া যাইত তাহা হইলে এ-যাত্রায় এতদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বুকে করিয়া এই ছোট ট্রেনখানি ৺বৈদ্যনাথ ষ্টেশন পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পাইত না। এতদিন পরে ৺বৈদ্যনাথ তাঁহার আদরের দুলালকে নিকটে পাইবার ইচ্ছায় ট্রেনে করিয়াই ষ্টেশন পর্য্যন্ত তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন।

এইবার মনে হইতে লাগিল, শ্রীগুরু যাহা করেন, তাহা মঙ্গলেরই জন্য করেন ; কারণ, ট্যাক্সিতে দেওঘর পৌঁছাইলে আজই ঠাকুর বৈদ্যনাথ মন্দিরে ৺বাবা বৈদ্যনাথের আদর লইতে কখনও আসিতে পারিতেন না। তাই, আর একটি দিনও তিনি অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, আজ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। মধ্য পথেও ট্রেনখানি দুইবার থামিয়াছিল, একবার ডাবুর কোম্পানির নিকট, আর একবার দারোয়া নদীর উপর। ইতিপূর্ব্বে কতবার এ পথে যাতায়াত করিয়াছি, কখনও কিন্তু এ রকম ধারায় ট্রেন থামে নাই। অদ্য ট্রেনখানি থামিবারই বা বিশেষ কি আর কারণ থাকিতে পারে ? নিশ্চয়ই ইহার মধ্যেও কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

এই যে নদীটি বৎসরের মধ্যে বর্ষাকাল ছাড়া বাকী কয়মাসই ফল্গুপ্রায় অন্তঃসলিলা। কি জানি, ঐ অন্তঃসলিলা দারোয়া নদীর অন্তর কোন অস্ফুট ভাষায় আজ ভরা ! তাই কি আত্মহারা হইয়া মঙ্গল উদ্দেশ্য সফল করিতে তাহার চিরকে প্রিয়কে বক্ষে ধরিয়া

রাখিবার এই আকুতি! তাই কি ইচ্ছা শক্তির প্রবল আকর্ষণে চলন্ত ট্রেনখানি তাহার বক্ষোপরি স্থাপিত করিল! তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে কিনা আমাদের জানা নাই। তবে যিনি ইচ্ছা পুরাইতে পারেন তিনি জানেন! আর, জানে ঐ নির্ব্বাক অন্তঃসলিলা ক্ষুদ্র দারোয়া নদীটি।

চিন্তা করিতেছি, কতক্ষণ জানি না,—শুনিলাম, সঙ্গের গুরু-ভাই-ভগ্নীরা বলাবলি করিতেছেন, "ঐ দেখ, নন্দনপাহাড় কি সুন্দর-ই না দেখাচ্ছে।" এইবার মঞ্জু-মা বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দেখুন দেখুন— হিল ভিউ' দেখা যায়।" 'হিল ভিউ'—আমাদের গন্তব্য স্থান।

ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। আমিও সকলের সঙ্গে এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম।

ক্রমে ট্রেনখানি গুমটি পার হইয়া ৺বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে পৌঁছাইল।

দেওঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর

ট্রেনখানি পৌঁছাইবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি কুলি আমাদের মালপত্র নামাইয়া প্ল্যাট্‌ফরমে রাখিল। এর পরে আবার ট্যাক্সি ডাকার পালা। বিভূতিভূষণের উপরই ঠাকুর এ ভার ন্যস্ত করিলেন। ঠাকুরের কৃপায় বিভূতিকে এবার আর বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হয় নাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্যাক্সি লইয়া বিভূতিভূষণ ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলেন। সকলে মিলিয়া ট্যাক্সির আরোহী হইলাম।

এইবার গাড়ীখানি যে পথে চলিল সে পথ অতি মনোহর—অতি মনোরম। এতক্ষণ যে পথের উদ্দেশ্যে আসিতেছিলাম, এইবার সে পথে আমরা চলিয়াছি। একটুখানি আগাইয়া আসিয়া আমরা সকলেই পথের দুইধারের চিত্তহারী দৃশ্য সকল দেখিতেছি—বস্তুতঃ, পথের দৃশ্য দুইধারে অতি চমৎকার।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এবার তোদের আমার পূর্ব্ব বাসস্থান দেখাবো। এইস্থানে আমি একলা থাকতাম।" বলিতে বলিতে পথি পার্শ্বে ছোট্ট একখানি বাড়ীর কাছে আসিয়া গাড়ী পৌঁছাইল। ঠাকুর গাড়ী চালককে বাড়ীর সামনে গাড়ী থামাইতে ইঙ্গিত করিলেন। গাড়ীখানি থামিতেই আমরা সকলে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। ঠাকুর

সকলকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর চতুষ্পার্শ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইতে লাগিলেন।

বাটীখানির নাম "চন্দ্রকুটীর"। বাড়ীটির দিকে চাহিয়া আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল—

"আজি মনে পড়ে—কত কথা,
কত স্মৃতি, কত গীতি,
কত স্বপন, কত ব্যথা।"

আমি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় কানে আসিল মঞ্জু-মা ক্ষণে ক্ষণে সকলকে বলিতেছেন,—"এই দেখুন, বাবু এখানে শুতেন, এখানে বসতেন, এখানে নিজে রান্না করতেন। আমি তখন ছোট্ট ছিলাম। বাবু এই ঘরে বসে চিঠি লিখতেন, আর আমি এই বারান্দায় বসে খেলা করতাম।" আর আমি যত এদিক-ওদিক দেখিতেছি, পুরাতন স্মৃতিগুলি একটি একটি করিয়া আমার চোখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

এই সেই স্থান—যে স্থানে আমার আরাধ্যের প্রথম দর্শন লাভ হয় অর্থাৎ এই স্থানেই প্রথম আসিয়া শ্রীচরণ যুগল নিজ শিরে শ্রদ্ধাপ্লুতচিত্তে তুলিয়া লই। এই স্থানেই সাধন জীবন আমি বরণ করিয়া লই।

সেদিন শ্রীগুরু পূর্ণিমার দিন। সকাল আটটার সময় আসি আমার আরাধ্যের কোন এক অজানা আহ্বানে। আনিয়াছিলাম হাতে ধরিয়া সাজি ভরা গন্ধরাজ পুষ্প ও সেই পুষ্পেরই বড়

একখানি মালা। যখনই শ্রীচরণে ওই পুষ্প ও মাল্য অঞ্জলি ভরিয়া অর্ঘ্য দিয়া শ্রীচরণ দু'টি স্পর্শ করিলাম, হঠাৎ দেখি স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল ও শ্রীমুখে অর্দ্ধ-স্ফুট স্বরে "মা" "মা" ধ্বনি উচ্চারিত হইয়া দেব-শরীরটি ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কি এ!—সমাধি! আমি ইতিপূর্ব্বে সমাধি কাহাকে বলে জানিতাম না, মাত্র বইয়ে পড়িয়াছিলাম। জীবনে কোন দিন কোন মহাপুরুষেরই সমাধি দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। বাবা সাথে ছিলেন। পিতৃ সমীপে আমি এই প্রথম সমাধি দর্শন করিলাম। আমার মগ্ন-চৈতন্য মথিত করিয়া হৃদয়-ধাম আমার আনন্দের বন্যায় প্লাবিত হইয়া গেল। সেই প্লাবনের বেগে দেহে-মনে পুলক শিহরণ খেলিতে লাগিল। কি এক অজানা অমৃতময় জগতের সুখ-সংযোগের দোলা লাগিল আমার রক্ত-ধমনীতে! কী এক জ্যোতির্ম্ময় শান্ত সমাহিত অবস্থার পূর্ব্ব-স্বাদ না জানি আমি পাইলাম! জীবনে আমার জোয়ার আসিল! জয় গুরু!—

"এ জল-তরঙ্গ রোধিবে কে?
—হরে মুরারে! হরে মুরারে!!"

... ...

যাহা হউক, আমার নব জীবনের আদি তীর্থ-পীঠ পরিক্রমণ করিয়া আমরা সকলে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। ক্রমে গাড়ী চলিতে লাগিল। সমস্ত রাস্তাটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর এটি-ওটি-সেটি করিয়া সকলকে পর-পর বাড়ীগুলি দেখাইতে লাগিলেন। পরে

দেওঘরের কোর্ট-কম্পাউণ্ড আসিতেই আমি বলিয়া উঠিলাম, "আমরা এসে পড়েছি, এবার গাড়ী ডানদিকে ঘুরবে।" সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ডান দিকে ঘুরিল এবং একটু যাইতেই অদূরে সাদা রঙের একখানি দ্বিতল বাড়ী আমাদের দৃষ্টি পথে পড়িল। মঞ্জুষা চেঁচাইয়া উঠিলেন, "ওই হিল ভিউ, ওখানে আমরা যাচ্ছি।" এইরূপ আনন্দ কোলাহলের মধ্যে গাড়ীখানি গিয়া ওই দ্বিতল বাড়ীটির ফটকের সামনে সহসা দাঁড়াইল। গাড়ী-বারান্দায় কয়েকজন বসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে, এসে গেছে।"

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গাড়ীর কাছে ছুটিয়া আসিলেন। কেবল আমাদের পূজনীয় বৃদ্ধ দাদুভাই ও পূজনীয়া বৃদ্ধা ঠাকুরমাতা এত শীঘ্র চার-পাঁচটি সিঁড়ি নামিয়া গাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছাইতে পারেন নাই। সকলের এই ছুটিয়া আসার মধ্যে এমন ভাব ফুটিয়া উঠিল যে ইঁহারা হয় ঠাকুরের আগমনের পূর্ব্বাভাষ পূর্ব্ব হইতে নিশ্চয়ই কিছু পাইয়াছেন অথবা অন্তরে তাহা অনুভব করিয়াছেন।

* * *

এইখানে একটি কথা বলি। এই যে বলিলাম পূর্ব্বাভাষ-আগমনীবার্ত্তা ইঁহারা নিশ্চয়ই পাইয়া থাকিবেন—এই রকম ঘটনা আজ প্রথম নহে। ইহার পূর্ব্বে আরও বহুবার এইরূপ ঘটনা বহু ভক্ত বহু সন্তানদের মধ্যে ঠাকুর কৃপা করিয়া ঘটাইয়াছেন। ঠাকুর হয়ত পূর্ব্বে সংবাদ দিতে পারেন নাই তিনি যে স্থানে যাইবেন

সেই স্থানের ভক্ত সন্তানদের, কিন্তু কোন এক অজানা ইঙ্গিতে শ্রীশ্রীঠাকুর আসিতেছেন এই বার্ত্তা পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহাদের অনুভব করাইয়া দেয়। যাহা হউক, ইহাদের বেলাও তাহাই হইয়া থাকিবে।

* * *

একে একে আমরা সকলেই গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। বৃদ্ধ দাদুভাই ও পূজনীয়া ঠাকুরমাতার শ্রীচরণধূলি সকলেই একের পর এক মাথায় তুলিয়া লইলাম।

এই বারের যে দৃশ্য তাহা অপূর্ব্ব! যতক্ষণ আমাদের প্রণাম পর্ব্ব চলিতেছিল ততক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুর অদূরে দাঁড়াইয়া ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। এইবার আমরা সরিয়া দাঁড়াইতে তিনি ধীর পদক্ষেপে তাঁহার কাষ্ঠ পাদুকা যুগল খুলিয়া তাঁহার চির আরাধ্য স্নেহপ্রবণ পিতৃমাতৃ সমীপে আগাইয়া আসিলেন। এই সময় তাঁহার মুখ মণ্ডল এক অপূর্ব্ব-শ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চক্ষু দু'টি ঢুলু-ঢুলু, অধরে ঈষৎ হাস্য রেখা ও সমগ্র শরীরে এক ভক্তি-বিনম্র ভাব। তিনি ধীরে ধীরে পিতৃদেবের চরণ যুগলে প্রণত হইলেন। আহা কি সুন্দর সে দৃশ্য! আমার ছেলেবেলাকার পড়া একটি ছত্র তখন মনে পড়িল—

"অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি দেব জগন্নাথ
ভূমি লুটি' যে চরণে করে প্রণিপাত।"

শ্রীশ্রীঠাকুর উঠিয়া নতজানু হইয়া বসিলে দাদুভাই তাঁহার পুত্রের শিরে হস্ত রাখিয়া চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর করিলেন।

পরে ওখান হইতে উঠিয়া ঠাকুর তাঁহার স্নেহময়ী গর্ভধারিণীর চরণ যুগলে পুনরায় প্রণত হইলেন। যখন ঠাকুর প্রণাম করিতেছেন, তখন আমাদের স্নেহসিক্তা ঠাকুরমার দিকে চাহিয়া দেখি, তাঁহার চোখ দু'টি হইতে আনন্দাশ্রু ঝড়িয়া পড়িতেছে, ওষ্ঠাধর হাস্য রেখায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার আদরের দুলালকে হাত ধরিয়া নিজ কোলে তুলিয়া লইলেন ও শির-চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আজ আমার বড় আনন্দ—শুধু যে তোমাকে পেলাম তা নয়, সেই সঙ্গে আমার এতগুলি নাতি-নাতনীকেও পেলাম। চল, ভিতরে চল।"

ঠাকুরের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅবনীকুমার, একমাত্র সহোদরা ভগ্নী শ্রীযুক্তা স্নেহময়ী দেবী ও তাঁহার কন্যা শ্রীমতী মীরা, একে একে শ্রীচরণে অবনত হইয়া প্রণাম করিলেন। সকলেরই নয়ন আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ। এতক্ষণ আমাদের সহিত মঞ্জু বলিয়া মেয়েটির কথা বলিতেছিলাম। ইহার পরিচয় এখানে দিতেছি। মঞ্জুমা ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অমর কুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা কন্যা। শুধু ইহাই ইঁহার পরিচয় নহে। মঞ্জু আমাদের চিরআরাধ্য আচার্যাদেবের মানস কন্যা।

বহুদিন পর দাদুভাই ও ঠাকুরমা এবং আত্মীয় স্বজন মঞ্জু-মাকে কাছে পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া নানা ভাবে নানা কথায় তাঁহাকে আদর করিতে লাগিলেন। আমরা সকলে দূরে দাঁড়াইয়া এই আনন্দের মিলন দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছিলাম।

আজ আমাদের ঠাকুর যেন পঞ্চম বর্ষের বালক। এমন কি নয়ন দু'টি পর্য্যন্ত বালক সুলভ চপল হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর দৃষ্টির মধ্যে সেই গম্ভীর পিতার ভাব খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছেনা।...

আমাদের প্রণাম আশীর্ব্বাদ শেষ হইলে দাদুভাই প্রভৃতি সকলেই বলিতে লাগিলেন, "আজ কেবলই ত' মনে হচ্ছিল—তুমি আসছ।" ঠাকুরের সহোদরা বলিলেন—"প্রত্যেকদিন আমার কাপড় কাচতে সন্ধ্যে হ'য়ে যায়। আজ কি জানি কে যেন আমায় ঠেলে কাজ করিয়ে নিলে। কাজ গুছিয়ে এই বাইরের দালানে কে নিয়ে এল।" শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথা শুনিয়া সকলের দিকে চাহিয়া শুধু বলিলেন, "হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে, আমি ভেবেছিলাম তোমরা নিশ্চয়ই জানতে পারবে– আমি আজ আসছি।"

পিতৃ মাতৃ সকাশে শ্রীশ্রীঠাকুর

পূজনীয়া স্নেহময়ী ঠাকুরমাতার স্নেহ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ ঘিরিয়া রহিল। আমাদের বৈকালিক স্নান, চা-পান, জলযোগ ইত্যাদি পরের পর ব্যবস্থা হইতে লাগিল। গৃহকর্ত্রী সুনিপুণা। যে নিপুণ হস্তে ষোলকলায় পরিপূর্ণ আমাদের আরাধ্যদেব লালিত-পালিত হইয়াছিলেন, এ তাঁহারই গৃহস্থালী।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা ভিতরের উঠানে একটি উঁচু রোয়াকে বসিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর একখানি আরাম কেদারায় শরীরটি এলাইয়া দিয়া বসিয়াছেন। সম্মুখে দাদুভাই একটি তক্তপোষের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায়। আমাদের সকলের আদরের মঞ্জু-মা দাদু-ভাইয়ের শিয়রে বসিয়া তাঁহার শিরের পক্ককেশের ভিতরে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছেন। আমরা সকলে তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিয়া আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টি ওই দূর শূন্য আকাশের পানে বিস্তৃত—দূরে পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়া রক্তিমাভ অস্তগামী সূর্য্যের দিকে নিবদ্ধ। ঠাকুর বলিতেছেন, "ওই দেখ, জগতপ্রাণ শ্রীসূর্য্যদেব শ্রীপাঠে বসেছেন। আকাশ কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে! আরও সুন্দর বাড়ীখানির মধ্যে এই জায়গাটি।"

একথা শুনিয়া দাদুভাই বলিলেন, "শুধু তাই নয়, আবার এই দিকে দেখ, পর্ব্বত শিখরস্থিত তুষার শুভ্র শ্রীনন্দনেশ্বর জিউর

মন্দির। এই পাহাড়টির নাম—এদেশের লোকে বলে নন্দন পাহাড়। এখান থেকে ছোট দেখালেও এ ততটা ছোট নয়, বেশ উঁচু।” সকলেই সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুরলীমোহন বলিয়া উঠিলেন, “বাড়ীখানির সৌন্দর্য্য সত্যিই কি চমৎকার! যেন শান্তি নিকেতন।”

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বাড়ীখানির ছোট একটি ঘরে শালগ্রাম-শিলা স্থাপিত। শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া আরতি সুরু হইল—পূজক আমাদের পূজ্যপাদ দাদুভাই। আরতি সমাপ্তে আমরা সকল গুরুভ্রাতা ভগ্নী মিলিয়া শ্রীগুরু চরণে প্রণাম সারিয়া পূজনীয় দাদুভাই ও ঠাকুরমাতাকে প্রণাম করিলাম।

একটি ব্যাপার এতক্ষণে আমরা বুঝিলাম—ঠাকুরের ৺বৈদ্যনাথ ধামে আগমনের ইচ্ছা এত প্রবল হইয়াছিল কেন। আমরা এখানে আসা অবধি একটি অচেনা স্বামীহীনা অর্দ্ধবয়স্কা রমণীকে এইস্থানে দেখিতেছিলাম। তাঁহার মুখখানি যেন বিষাদ মাখা—আঁখিদ্বয় উন্মত্তবৎ। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। এক্ষণে দেখিলাম শ্রীশ্রীঠাকুর এই “মা’টিকে” ডাকিয়া নিজ পদপ্রান্তে আরাম কেদারার নিকট বসাইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে ও মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। পরে বলিলেন, “দে, আমার পা টিপে দে”। আমরা তখনও ভাবিতেছি—কে এই রমণী!

অধিকক্ষণ আমাদের সংশয়ের ভিতরে কাটাইতে হইল না। পূজনীয়া ঠাকুরমাতাই ইঁহার ব্যথাভরা পরিচয়টি আমাদিগকে গোপনে বলিলেন। শুনিলাম, এই অনাথা রমণী শ্রীশ্রীঠাকুরের

ভগিনীপতির জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া। ইহার নাম শ্রীযুক্তা নীহার দেবী। ইনি শুধু অনাথাই নন, সম্প্রতি ইঁহার একমাত্র পুত্র এবং ইঁহাদের বংশের একমাত্র বংশধর পূর্ণ ষোল বৎসর বয়সে হঠাৎ কলেজে গিয়া অন্যান্য যুবকদের সহিত খেলায় উন্মত্ত হইয়া খেলার খেয়ালে কোন এক বাড়ীর পাঁচতলা ছাদের উপর হইতে ছাদ ভাঙিয়া পড়িয়া অপঘাত মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছে। ঘটনাটি কলিকাতায় কালীঘাটে ঘটিয়াছে।

সান্ত্বনা দিবার কি-ই-বা আছে---সর্ব্বহারা এই মাতৃ হৃদয়কে। শুনিয়াছি, কালে শোক হয়, আবার একমাত্র কালই তাহা মুছাইয়া দিতে পারে। আজ দেখিলাম—অসম্ভব-ও সম্ভব হয়। এই দুরন্ত শোকও মুছিয়া যায়—যদি জীবনে দুঃখ-শোকের অতীত আনন্দ-ঘন এমন কেহ আসেন যাঁর সর্ব্বংসহ বিরাট বুকে দুঃসহ সকল দুঃখ-জ্বালা মুহূর্ত্তে বিলীন হইতে পারে। শুভঙ্কর—তিনি নীলকণ্ঠ। বল, বল দেব,

"কবে রে দুঃখ-জ্বালা,
হবে রে বিজয়-মালা!"

আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিলাম, ক্ষণপূর্ব্বে যাঁহাকে উন্মাদিনী মনে করিয়াছিলাম হৃত সর্ব্বস্বা সেই রিক্তা রমণী ঠাকুরের শ্রীপদ স্পর্শে যেন সৌম্য ভাব ধারণ করিলেন। তিনি ধীর স্থির নেত্রে দেব-দর্শন করিতে লাগিলেন, বলিলেন—"বড়দা, আপনাকে দেখে আমার বড়ই আনন্দ হচ্ছে। আপনি সহসা চলে যাবেন না। আপনি চলে গেলে চলবে না এ-রথ আর। আমার বড়

ভয়—কলকাতায় ফিরে যাবো কি ক'রে! তবু যেতে হবে, হায়!”……

শ্রীশ্রীঠাকুর যেন অন্যমনা। শুধু বলিলেন, “দূর পাগলী ওসব কথা এখন ভাবিস নে। আমায় এক গ্লাস খাবার জল দে দিকিন্, আর যা, আমার জন্যে পান সেজে নিয়ে আয়।” বুঝিলাম ঠাকুর শোকাতুরা জননীকে শোক মুক্তা করিবার চেষ্টা করিতেছেন!

সন্ধ্যা বিদায় লইল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। সাড়ে নয় ঘটিকা—ঠাকুরের ভোগের সময় হইয়াছে। পূজনীয়া ঠাকুরমাতা বলিলেন, “ওর খাবার তৈরী হয়ে গেছে। সব গুছিয়ে মঞ্জু-সোনা ঠিক করে এসেছে। এবারে চলো বাবা, খাবে চলো”—এই কথা বলিয়া ঠাকুরকে ডাকিলেন। আমরা পূজনীয় দাদুভাইকে সঙ্গে লইয়া সকলে ঠাকুরমার সঙ্গে সঙ্গে যে-স্থানে ভোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেখানে উপস্থিত হইলাম।

ঠাকুর ভোগে বসিলে আমরা সকলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভোগদর্শন ইচ্ছায় বসিয়া পড়িলাম। ঠাকুরের বামদিকে দাদুভাই বসিলেন। বহুদিন পর পিতা-পুত্রে একস্থানে আহারে বসিয়া যে আনন্দ-রস উপভোগ করিতে লাগিলেন তাহা আমরা অন্তরে অন্তরে সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। আর স্নেহময়ী জননীর—এতদিন পরে পুত্রকে নিজ আলয়ে পাইয়া আনন্দের আর সীমা নাই। কোনটি আগে দিবেন, কোনটি পরে দিবেন, কি ভাবে খাওয়াইবেন, কেমন করিয়া পুত্রকে পরিতৃপ্ত করিবেন—এ যেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। একবার বলিতেছেন,—“কতটুকু খেলে

বাবা, এতে কি পেট ভরে? ক্ষীরটুকু খেয়ে ফেল। কিচ্ছু তো খাও না—এতে কী শরীর থাকে?"—এইরূপ নানা কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিবারই জননীর কথামত সামান্য অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া প্রতিটি খাদ্য মুখে ঠেকাইতেছেন। বার বার আহারের এইরূপ দেখিয়া আনন্দময়ী জননী হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হয়েছে যাদু,—আর খেয়ে কাজ নেই। এত করে রান্না করলাম যা' যা' তুমি ভালবাসতে, যেমনটি চাইতে ঠিক সেই রকম ক'রে—কিচ্ছু খেলে না।" ঠাকুর বলিলেন, "খেলামই-ত মা, আর কত খাব? এর চেয়ে বেশী ভেতরে ধরে না।"

নির্ব্বাক জননী, স্নেহসিক্ত নয়ন-দু'টি প্রিয় পুত্রের পানে তুলিয়া ধরিলেন—মুখখানি শুধু দেখিলেন। একটি দীর্ঘ শ্বাস অজানা মুহূর্ত্তে ধীরে বহিয়া গেল তাঁহার বক্ষখানি ছাপাইয়া, তাঁহার কক্ষখানি কাঁপাইয়া। এই একটি নিশ্বাসে জননীর সকল কথা, সকল ভাষা আমাদের যেন বুঝাইয়া দিল—পরিচয় দিয়া দিল আমাদের আরাধ্য দেবের সন্ন্যাস জীবন ও আসক্তি ছেদন।

ধন্য জননী, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার দান! ধন্য পুণ্যবতী, ধন্য ভাগ্যবতী, ধন্য ধন্য আদর্শ প্রসবিনী! আজ যদি তুমি তোমার এই বুকভরা ধন নয়ন মনি—অঞ্চলের নিধিকে—তোমার প্রথম সন্তানকে এই ভাবে অঞ্চল ছাড়া না করিতে, এতখানি ত্যাগ যদি তুমি না করিতে, এই মহাদান তুমি যদি আজ বিশ্বের পাপী তাপীকে না করিতে, অঞ্চলের নিধিকে যদি তোমার ঐ ক্ষুদ্র স্নেহঅঞ্চলেই বাঁধিয়া রাখিতে, তবে কি

করিয়া বলত বিশ্ব আজ "বিশ্বজিৎকে" পাইত! কি করিয়া সহস্র সহস্র মহাপাতকী উদ্ধার হইত, কি করিয়া মোহান্ধ জীব মোহ ঘুচাইয়া মোহ মুক্ত হইয়া জ্ঞাননেত্র লাভ করিত! কেমন করিয়া বলত, দেবি, তুমি না দিলে আজ নিজেকে ভুলিয়া যাওয়া জীব নিজেকে আবার খুঁজিয়া পাইবার পথ দেখিতে পাইত! তাই বলি, প্রার্থনা করি—তোমার মতন জননী জগতের প্রতি ঘরে ঘরে গড়িয়া উঠুক—গৃহ গৃহে তাঁহারা আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিতা হউন। তোমারই কৃপায় তোমার নয়নাভিরাম বিশ্ব জননীর বরপুত্র আজ বিশ্বব্যাপীর অঞ্চল-ধন। বিশ্বশক্তি বিশ্ব মাতা তাঁহার অনন্ত দাক্ষিণ্যের সবখানি ঢালিয়া দিয়া এই আর্য্যকুমারকে "বিশ্বজিৎ" নামে ভূষিত করিয়াছেন।

অন্তরে অন্তরে আমরা প্রত্যেকে একটি প্রণাম পূজনীয়া ঠাকুরমাতার শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম।

ইতিমধ্যে ঠাকুরের ভোগ সমাপন হইল। বিভূতিভূষণ প্রসাদ পাইবার জন্য ঠাকুরমার আশ্রয় লইলেন। পূজনীয়া ঠাকুরমাতা আমাদিগকে সযত্নে কক্ষখানির মধ্যে বসাইয়া অতি যত্নে বড় আদরে খাওয়াইতে লাগিলেন। বিভূতিভূষণ সকলের অপেক্ষা বেশী উৎপাত করিয়া আমাদের ঠাকুরমাতার আহ্লাদ আরও বাড়াইতে চেষ্টা করিলেন।

আমাদের অর্দ্ধেক খাওয়া হইয়াছে, এমন সময় আমাদের সকলের আব্দার হইল ঠাকুরমা আমাদের সহিত এক্ষণি খাইতে বসুন নতুবা আমরা সকলেই ভুখ-হরতাল করিব। তিনিও

আমাদের এই আব্দার সানন্দে গ্রহণ করিয়া ছোট্ট বালিকার মত আমাদের সঙ্গে খাইতে বসিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের এই ব্যাপার শেষ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর যেস্থানে তাঁহার পিতৃদেবের সহিত বসিয়া কথোপ-কথন কবিতেছেন সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম।

দাদুভাই হাজাবিবাগ ও গয়ার আশ্রমস্থিত সন্তানদের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর একে একে পূর্ব্ব পরিচিত সংবাদাদি নিবেদন করিলেন। আশ্রমের মুখপত্র "অমৃত" দাদুভাই পড়িয়া থাকেন। কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য কেন্দ্রের সন্তানদেব শিক্ষা-দীক্ষা ও অসাম্প্রদায়িক, উদার, সত্য সনাতন ধর্ম্মেব প্রচার বিষয়ে কিছু কিছু কথা-বার্ত্তা হইল।

দেখিলাম, দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও নৈতিক অধঃপতন বৃদ্ধ দাদুভাইকে চিন্তা-জড়িত করিয়াছে। তিনি পুত্রের প্রাণান্তিক প্রয়াসকে অভিনন্দিত কবিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজী সুভাস চন্দ্রের দেশ আবার জাগিয়া উঠিবে ও জগত-সভায় বরেণ্য হইবে—দাদুভাই একান্তভাবে এই আশা পোষণ করেন। নেতাজীর লিখিত, আমার "দার্শনিক বিশ্বাস" প্রবন্ধটি বৃদ্ধকে আনন্দ দিয়াছে প্রচুর। তিনি বলিলেন, "দেখ, নেতাজী কি বলছেন—জীবন চলার পথে নিত্য সঙ্ঘটিত যে সমস্যাও সমাধানের খেলা চলেছে, একমাত্র প্রেমের দ্বারাই বাস্তব জগতের এই খেলার মধ্য দিয়া সেই সত্যস্বরূপ আত্মার ক্রম বিকাশ হতে থাকে।" প্রেমের ধর্ম্ম প্রচারে

তাঁহার বহুদিনের সঞ্চিত আশা-লতিকা পত্রে পুষ্পে, শাখা প্রশাখায় সুশোভিত হইতেছে দেখিয়া বৃদ্ধ দাদুভাই হর্ষোৎফুল্ল হইলেন।......

এই দিন আমাদের আর কোন বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা হয় নাই। তবে, একটি ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে না লিখিলে আজিকার আগমনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আজ মাসাবধি ৺বৈদ্যনাথবাসী নরনারীগণ এক বিন্দু বৃষ্টি বারির জন্য চাতক পক্ষীর ন্যায় প্রতিদিনই নাকি প্রার্থনা করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! আমরা এখানে আসিয়াও দেখিলাম, চতুর্দ্দিক সূর্য্যোত্তাপে তাপিত হইয়া যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। সেই কারণেই আমরা সকলে বলিলাম, "আজ বড় গরম। ভিতরে শু'লে ঠাকুরের ভীষণ কষ্ট হবে।" এই কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "আমি এই চাতালেই (ভিতর বাড়ীর উচ্চ প্রাঙ্গণ) আজ শুচ্ছি। যতক্ষণ না বৃষ্টি আসে কিছুতেই ভিতরে উঠে যাব না।" আমরাও বলিলাম, "তা'হলে আমরা সকলে এখানে গড়াগড়ি যাই।"

আমরা শুইলাম—তখন রাত্রি এগারটা। চমকিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া কপালে, গায়ের উপর পড়িয়া জাগাইয়া দিল, "ওঠ্—তোরা ওঠ্।" দেখি, তখনও শ্রীশ্রীঠাকুর গভীরে নিমগ্ন। মনে ভাবিলাম, কি সুন্দর! আমরা যতগুলি প্রাণী এস্থানে শুইয়াছিলাম, সকলেরই ঘুম ভাঙিয়া গেল, সকলেই উঠিয়া পড়িলাম, ঠাকুর যেন কত

ঘুমাইতেছেন। কানে এল—কোথায় দূরে ঢং-ঢং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিল। চিন্তা করিতেছি—ক্রমেই বৃষ্টি বাড়িতেছে—কি করিয়া ঠাকুরের ধ্যান ভঙ্গ কবি। সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি, ইতিমধ্যে ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, "এইখানেই শুয়ে থাকি, কি বল ?" আমরা সকলে এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম, এবং বলিলাম "না, এখানে নয়, উপরে চলুন। সেখানে বেশ ঠাণ্ডা বাতাস পাবেন।" যাহা হউক, একে একে সকলেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিলাম। বিভূতিভূষণ, মুরলীমোহন ও কাকুজী ঠাকুরের শয়ন কক্ষে উপর তলাতেই স্থান পাইলেন।

রাত্রি কখন চলিয়া গিয়াছে জানিনা। ঘুম ভাঙিল পূজনীয়া ঠাকুরমাতার জানালা খোলার শব্দে। শুনিতে পাইলাম—তিনি বলিতেছেন, "উঠে পড় সব।" এই কথা যেমন কানে আসা আমরা ত' উঠিলামই, শ্রীশ্রীঠাকুরও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলেন।

আজ শনিবার, ১০ই জুন। সকলে নীচের তলায় নামিয়া আসিলাম। সিঁড়িতে নামিতে নামিতে শুনিতেছিলাম পূজনীয়া দাদুভায়ের কম্পিত কণ্ঠে গীতা পাঠ। চাহিয়া দেখি দাদুভাই একা নহেন, তাঁহার আদরের নাতনী মঞ্জু-মা, সেটিও গীতা পাঠে নিরতা। একটি অশীতিপর বৃদ্ধ অপরটি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা। শত চেষ্টা সত্ত্বেও নাতনীর কণ্ঠস্বর দাদুভায়ের কণ্ঠে মিলাইতে পারিতেছে না। তথাপি প্রাতঃকালীন এই সুমধুর গীতা-পাঠ

যেন আমাদের কর্ণ-মন পবিত্র করিয়া সমস্ত বাড়ীখানিকে শুদ্ধ-শুচি করিয়া সকল আবহ-পরিবেশ ঝঙ্কৃত-মুখরিত করিয়া মহাব্যোমে উত্থিত হইতেছিল। অন্তর মথিত করিয়া কণ্ঠ আমার অস্ফুট-নাদে সেই কণ্ঠে মিলাইল—

"অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বংসমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥"

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে ঠাকুর বাহিরের ঘরে বসিলেন। আমি ভোগ ইত্যাদি বন্দোবস্তের জন্য ভিতরে রহিয়াছি। বাহিরে কথাবর্ত্তা হইতেছে শুনিয়া বিভূতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওরে, কে এসেছেন?"

বিভূতি-ভূষণ বলিলেন,—“একটি গৈরিকধারিণী সন্ন্যাসিনী ঠাকুরের নিকট বসেছেন এবং আরও চার পাঁচটি ভক্ত সে-স্থানে দেখলাম, তার মধ্যে দু'একটি অপরিচিত, আর সব এ বাড়ীর। সন্ন্যাসিনীকে ঠাকুর 'সাধু মা' বলে সম্বোধন করছেন। এই সাধুমার বয়েস আন্দাজ ষাট পয়ষট্টি বৎসর হবে। দেখলাম, ভারী আনন্দময়ী মূর্ত্তিখানি। এমন কোন কথা তিনি বলছেন না বটে কিন্তু যে কথাবার্ত্তার আদান প্রদান ঠাকুরের সাথে হচ্ছে তা' এত মিষ্টি যে সেখানে বসে পড়ে খানিক এই কথোপকথন শুনবার ইচ্ছা হল। হঠাৎ ঠাকুর আমায় বললেন, একটু বাজারের দিকে যেতে। এঁদের কি প্রয়োজন কাকুজীর সাথে গিয়ে নিয়ে আসতে।··· যাচ্ছি, পিসীমা।”

বিভূতিভূষণ ঠাকুরের আদেশ মত বৈদ্যনাথ বাজারে গিয়া ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোক ঠাকুরের নিকট আসিয়াছেন। তখন বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা। ক্রমে পূর্ব্বপরিচিত বহু নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতা একে একে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনেচ্ছায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইহার পর যথানিয়মে ৺শালগ্রাম জিউর পূজা, ভোগ ইত্যাদি সমাপনান্তে ঠাকুর ও দাদুভাই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তাহার পর ঠাকুরমাতা আমাদের প্রসাদ বিতরণ করিয়া নিজে গ্রহণ করিলেন। পরে আমরা ঠাকুরের সহিত দ্বিতলে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে উপনীত হইলাম। নীহার-মা, সঙ্গে আছেন। বেলা তিন ঘটিকা

পর্য্যন্ত নানারূপ সমালোচনা ও ঠাকুরের উপদেশে কাটিয়া গেল।

ঠাকুর যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

এই সংসারস্থ জীবের আত্মীয় বা প্রিয়জনের শরীরের অভাব ঘটিলে যে শোকের উৎপত্তি হয়, ইহা সম্পূর্ণ তাঁহাদের অজ্ঞতা-বশতঃই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই অজ্ঞতাটি কি?—ইহা আমাদের অন্তরস্থ দুর্নিবার মোহ মাত্র। এই মোহ কিরূপে আসে?—আমাদের অন্তরে বহুমুখীন অনন্ত প্রসারী আশা বা আকাঙ্ক্ষা হইতেই ইহার সৃজন হয়। তোমার একটি পুত্র হইল। তুমি মা, বা ঐ নবপ্রসূত শিশুটির পিতা বা স্বজন সঙ্গে সঙ্গে ঐ শিশুটিকে উপলক্ষ্য করিয়া মনের মধ্যে বহুবিধ আশা পোষণ করিতে লাগিলে। এই আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য এত অধিক যে, জীবের মৃত্যু বা শরীরের ক্ষণ ভঙ্গুরতা যাহা চিরন্তনী বা একমাত্র সত্য, তাহা ভুলিয়া গেল। জীবনের যে কোন নিত্যতা নাই, ইহা দেখিয়া শুনিয়াও তাহারা বুঝিতে পারে না। চিন্তা দুর্নিবার! কুহকিনী আশা তাহাদের এমন মুগ্ধ করিয়া রাখে যে এ জগতে যাহা একমাত্র সত্য, তাহাকে বুঝিতে বা চিন্তা করিতেও অবসর দেয় না। সত্যিকারের কিন্তু ঐ মৃতের জন্য আমাদের শোক হয় না। আমাদের আশা বা আকাঙ্ক্ষার অপরিপূরণই হইতেছে এই শোকের হেতু। যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের অন্তরে আশা বা আকাঙ্ক্ষা

পুষ্ট হইয়াছিল সেই উপলক্ষ্যের অভাব হইল বলিয়াই আমাদের শোক। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই ইহা বেশ বুঝিতে পারিবে।

তোমার ছেলেটি যদি আজ বিদেশে চাকুরী করিতে যাইত, তাহা হইলেও তোমার মনে এই আশা পোষিত হইত যে সে স্থূলে দূরে চাকুরী করিতেছে এবং তোমার আশা বা আকাঙ্ক্ষা সময়ে সে পূরণ করিবে। যদি সেই পুত্র তোমার আশানুরূপ সেবা তোমাদের না করে, তাহা হইলে উহার দেহান্ত হইলে তোমাদের যে শোক বা দুঃখ উপস্থিত হয়, ঐরূপ অবস্থায় তাহা হইতে কোন অংশে কম হইবে না এবং তখন তোমরা অর্থাৎ স্বজনগণ এই কথাই বলিবে, "ওর বেঁচে থাকাও যা, মরে যাওয়া-ও তাই, ওর বেঁচে থেকে কি হবে!" ইহাই তো হইবে তোমাদের উক্তি। এই গেল এক দিক।

অন্য দিক দিয়াও বিবেচনা করিয়া দেখ। তোমরা আজ তাহার স্থূল শরীরের অভাব হেতু অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছ! কেন?—না, তোমরা তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতে বা সে তোমাদের অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। ইহাই যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে যাহাকে আমরা স্বভাবতঃ ভালবাসি, সে যাহাতে সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে, আনন্দে থাকে, আমরা সর্ব্বদাই সে বিষয়ে চেষ্টা করিয়া থাকি। আচ্ছা, এখন দেখতো,—এ সংসারে সুখী কে? কোন না কোন দুঃখে প্রত্যেকেই আমরা অল্প বিস্তর

কষ্ট পাইতেছি। তুমি সংসারের একজন লোককেও জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে না যে,—"আমি সুখী।" কাজেই দেখ, এ জগতের ধূলি কাদা গায়ে লাগিবার আগে শান্তিময় শ্রীভগবান তাহাকে তাঁহার শান্তিপ্রদ বক্ষে আশ্রয় দিয়াছেন,—যেখানে রোগ শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য প্রভৃতির লেশ মাত্র নাই। অনাবিল শান্তি যেস্থানের একমাত্র স্বভাব, এমন একটি স্থানে যদি সে তাহার কার্য্যকালের জন্য আশ্রয় পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য তোমাদেব লেশমাত্র দুঃখ থাকা উচিত নয়। কারণ, যদি তোমরা সত্যই তাহাকে ভালবাস, তাহা হইলে সে যদি আজ স্থূল-শরীরে তোমাদের কাছে থাকিত, তোমাদের শত চেষ্টা, শত যত্নেও সর্ব্বতোভাবে সুখ বা শান্তি তাহাকে দিতে পারিতে না, কেননা, —কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ তাহাকে করিতেই হইত। সে উপস্থিত কিছুদিনের জন্য ইহা হইতে মুক্তি পাইল। অতএব ঘটনা যাহাই হউক না কেন, অন্তুতঃ তার জন্য তোমাদেব দুঃখ করা উচিত নয়।

এখন যদি তোমরা ইহা বুঝিয়া দুঃখ কর, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তোমরা তাহার জন্য দুঃখিত হইতেছ না। তোমরা নিজ স্বার্থের জন্য দুঃখিত হচ্ছ। কেমন, নয় কি ভাই?

—এরূপ অবস্থায় উপরোক্ত দুটি যুক্তি ছাড়া কোন যুক্তিতেই তোমাদের মন প্রবোধ মানিবে না।

—এ সংসার খেলাঘব মাত্র। আমরা সকলেই দুদিনের জন্য খেলা করিতে এখানে আসি। খেলার শেষে সকলেই যে যাহার

বাড়ী চলিয়া যাইব! কেহ চিরদিনের জন্য এ জগতে আসে না। এ জগতে কাহারও থাকিবার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। সে তাহার প্রকৃত পিতা মাতার কাছ হইতে যতটুকু ছুটি পাইয়াছিল. সে ততটুকু সময় তোমাদের খেলাঘরে থাকিয়া খেলা করিয়াছিল। "পিতা-মাতা জায়া অপত্য বান্ধব, আত্মা তো কখনো নহে এই সব।" এই খেলাঘরে এক একজন তাহার মা-বাবা, ভাই-বোন, কাকা-কাকী সেজে ছিল মাত্র। খেলান্তে তাহার পিতা তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছেন। তোমরা খেলা ঘরের পিতা-মাতা—যদি তাহার উপর সত্যিকারেব সম্বন্ধ পাতিয়া থাক, তাহা হইলে তো দুঃখ পাইতেই হইবে। কেননা, সে কোনদিনই তোমাদের ছিল না, আজও সে তোমাদের নয়। যে পরের ছেলে তোমাদের সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়া খেলার ছলে মা-বাবা সম্পর্ক পাতিয়াছিল, ওগো খেলাঘরের সাজা মা-বাপ, তোমরা যদি সত্যিকারের পরের ছেলের উপর নিজের পুত্রত্ব বোধ স্থাপিত কর, তাহা হইলে সে দোষ কাহার? পরের জিনিষে লোভ করিতে নাই, তাহাতে দুঃখই আসে। কি আর বলিব,—"ত্যজ অতএব বৃথা শোকরাশি।" আমার এই কথাগুলি তোমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। শান্তিময় নারায়ণ তোমাদের শান্তি দিন।

—এইবার আরও কিছু কথা বলি। কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ দেখিয়া তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভীত

হইয়া পড় প্রায়ই। শোন, এ সংসারে সুখ বা দুঃখ কেহ দিতে পারে না। পূর্ব্বাপর জীবনের কর্ম্মাবলী দুঃখ-সুখের একমাত্র কারণ হইয়া থাকে। আমরা কোন কিছু ঘটনা বা কোন ব্যক্তি বিশেষকে উপলক্ষ্য করিয়া ইহা ভোগ করিয়া থাকি, এবং ভোগকালে মনে করি, ঐ ঘটনা বা ঐ ব্যক্তিই আমার সুখ-দুঃখের কারণ। ইহা ভুল। ঐ ঘটনা বা ব্যক্তি বিশেষ কখনও তোমার সুখ-দুঃখের কারণ হইতে পারে না। উহারা তোমার সুখ-দুঃখের উপলক্ষ্য মাত্র। যেমনটা করিয়াছি, তেমনটা পাইতেছি; যেমনটা করিব, পাইবও তেমনটাই।"

"নিজ হস্তে রজ্জু যাহে আকর্ষণ।"

—তোমাদের চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। পূর্ব্ব জীবনের কর্ম্মফল স্বরূপ তোমরা ইহ জীবনে হয়তো দুঃখ ভোগ করিতেছ। যেহেতু প্রথম হইতেই দুঃখ পাইতেছ, সেইজন্য ভয় পাও—হয় তো চিরজীবন দুঃখেই কাটিবে। ঐরূপ হইতে পারে না। কেননা, এ জগতে কেহই চিরজীবনই সুখ বা দুঃখ ভোগ করে না। দুঃখের পর সুখ এবং সুখের পর দুঃখ,—ইহাই সংসারের নিয়ম! দেখা যায়, প্রথম জীবনে হয়তো কেহ খুবই দুঃখ ভোগ করিল, দুঃখ ভোগান্তে তাহার সুখ আসে। আবার কেহ হয়তো প্রথমে সুখ ভোগ করিল, সুখ ভোগান্তে দুঃখ আসে। ইহাই নিয়ম। কেননা, কেহ চির জীবনই অশুভ কর্ম্ম করিয়াছে, শুভ কর্ম্ম মোটেই করে নাই—এরূপ হইতে পারে না। প্রতিটি জীবন শুভ কর্ম্ম ও অশুভ কর্ম্মের মিশ্রণ।

তবে পরিমাণ কম বেশী হইতে পারে। ইহা পূর্ব্ব জীবনে শুভ কর্ম্মের পরিমাণ যদি বেশী হয়, ইহ জীবনে সুখের পরিমাণ বেশী হইবে, এবং পূর্ব্ব জীবনে অশুভ কর্ম্মের পরিমাণ যদি বেশী হয়, ইহ জীবনে দুঃখের পরিমাণ বেশী হইবে। কাহারও ভাগ্যের সহিত কাহারও ভাগ্যের মিলন হইয়া গেলেও তারতম্য ঘটে না, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।...



৺বৈদ্যনাথ মন্দিরে

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "এবারে তোমরা সকলে প্রস্তুত হয়ে নাও, আমি আজ সন্ধ্যায় ৺বাবার মন্দিরে যাব।" তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল ও মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। সকালে একখানি ট্যাক্সি ঠিক করিয়া আসা হইয়াছিল। গাড়ীখানি সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় আসিয়া দাঁড়াইল। মুরলী-মোহন, কাকুজী, বিভূতিভূষণ, মঞ্জু-মা ও আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে বৃষ্টির মধ্যে মোটরে করিয়া দেওঘর বাজারে গেলাম।

বাজারে যাইয়া জিনিষ পত্র কিনিবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "তোমরা সকলে বাড়ী যাও, আমি একটু ৺বাবার মন্দিরে যাব। তোমাদের কোন চিন্তা নেই, আমি সেখান হয়ে একটি রিক্সা করে বাড়ী ফিরব।"

আমি বলিলাম, "না, আপনাকে আমরা একেলা কি করে ছেড়ে দেব। বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার রাস্তা। তা ছাড়া মন্দিরে অত্যন্ত ভিড়। এ অবস্থায় আমরা কিছুতেই আপনাকে একেলা ছেড়ে দেব না।" এ কথা শুনিয়া সকলেই আমার কথা সমর্থন করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "ওরে না রে না, তোদের কোন ভয় ভাবনা নেই। তোরা যা, আমার কিছু হবে না।"

আমরা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। বুঝিতে পারিতেছি ঠাকুরের একা তাঁহার প্রিয়তম দেবতার কাছে যাইবার ইচ্ছা। কিন্তু আমরা ত জানি, কোন দেবস্থান বা মন্দিরে গেলে ঠাকুরের অবস্থা কি হয়। তাঁহার বাহ্যবোধ কিছু থাকে না। বহুবারই আমরা দেখিয়াছি, কোন মন্দির বা দেবতার নাম হইলেই তিনি অন্তর্মুখী হইয়া যান। তিনি অন্তর্জগতের মানুষ, অন্তরই যে তাঁহার নিজস্ব স্থান, বহির্জগত যে তাঁহার খেলার প্রাঙ্গণ।

এই কথাগুলি বলিতেছেন, এখনই কেমন যেন তাঁহার অন্যমনা ভাব।—যদি সমাহিত হইয়া যান, যদি শ্রীঅঙ্গটি কোথাও পড়িয়া যায়, যদি দেবদেহে কোথাও ব্যথা লাগে;—না, না, কিছুতেই একা ছাড়া চলে না। কাতর কণ্ঠে আমরা বলিয়া উঠিলাম,—"ঠাকুর, আমাদের নিয়ে চলুন। আমরাও ৺বাবাকে দর্শন করে আসি। এক সঙ্গে গুরু বিশ্বনাথ দর্শন করবার সৌভাগ্য দয়া করে আমাদের দিন।"

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"পাগল, গুরু আর বিশ্বনাথ কি আলাদা রে? গুরুই তো বিশ্বনাথ।"

আমরা আব্দারের সুরে বলিলাম, "না, আমরা যাবই।"

তখন তিনি মৃদু হাসিয়া আমাদের লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন, বলিলেন "তা বেশ, চল।"

বৃষ্টির মাঝে ঠাকুরের সঙ্গে আমরা মন্দিরাভিমুখে রওনা হইলাম। রাত্রিদেবী ততক্ষণে তাঁহার কাল ঘোমটায় সারা

পৃথিবীকে ঢাকিয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উর্দ্ধশ্বাসে মন্দিরের দিকে ছুটিতে লাগিলেন। আমরাও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলাম। তাঁহার ডাক শুনিয়া যেন স্থির থাকিতে না পারিয়া যত শীঘ্র সম্ভব দেখা দিতে শ্রীশ্রীঠাকুর ধাবমান। কিছুক্ষণ পরে আমরা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর গণেশের মন্দিরে প্রণাম করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। তারপর ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ পথে দুই পার্শ্বের উঁচু ধাপির একটিতে আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মন্দিরের দ্বার খুলতে কত দেরি আছে?"

একজন পাণ্ডা উত্তর দিলেন, "আধ ঘণ্টার কম ত নয়ই, বরং এক ঘণ্টাও হতে পারে।"

লক্ষ্য করিলাম, ঠাকুর তখন যেন অন্য জগতে—কাতর কণ্ঠে কাহার কাছে আবেদন জানাইতেছেন। আর দু'চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে। পাণ্ডারা তাঁহাকে উঠিয়া বসিতে বলিতেছেন। কিন্তু কে শোনে। মুহুর্মুহুঃ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে কম্পন হইতেছে।

পাঁচ মিনিটও হয় নাই, এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল। যে মন্দিরের দ্বার খুলিতে প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব ছিল, সে মন্দিরের দ্বার পাঁচ মিনিটের মধ্যে খুলিয়া গেল। এ যেন ৺বাবা বৈদ্যনাথ স্বয়ং দ্বার খুলিয়া দিয়া তাঁহার আদরের দুলালকে কাছে টানিয়া নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর "ওঁ হর হর বম্ বম্!" "জয় ৺বাবা বৈদ্যনাথ!" বলিয়া লাফাইয়া উঠিলেন—ভিতরে গেলেন, এবং

৺বাবার মন্দিরের দ্বারের পার্শ্বে হঠাৎ ছিন্ন কদলী বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইয়া শিশুর মত ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"সে-ধ্বনি উঠিয়া আর্ত্ত-নিনাদে
বিধাতৃ-চরণে পড়িয়া কাঁদে"...

তাঁহার দেব-শরীর নিথর নিষ্কম্প—এক অপূর্ব্ব নীলাভ জ্যোতিতে তখন সেইস্থান উদ্ভাসিত। ৺বাবা বৈদ্যনাথ তখন যেন সেই স্থানে সশরীরে বিরাজমান, মন্দিরের অভ্যন্তরে তাঁহার মাত্র বাহ্য আবরণই যেন ছিল মাত্র। মন আমাদের এক অনাস্বাদিত রসে আপ্লুত হইয়া গেল।—"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন।" বার বার আমাদের সকলের আঁখি অশ্রুসিক্ত হইতে লাগিল। মন গাহিয়া উঠিল—

"ওগো ভেঙেছ দুয়ার,
এসেছো জ্যোতির্ম্ময়।
তোমারি হউক জয়।"

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ যাইবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর টলিতে টলিতে মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং আমরা শ্রীঅঙ্গের দুই পার্শ্বে মন্ত্র মুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সহসা শুনিতে পাইলাম, কে যেন বার বার বলিতে লাগিলেন—"অন্দর যাইয়ে।"

সুপ্তোত্থিতের মত হঠাৎ জাগিয়া ঠাকুর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং ৺বাবার পিনাকের উপর হাত রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন ও মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেলেন।—সমাধি! নিশ্চল

স্তম্ভন! শুধু ভাসে, শুধু হাসে, শুধু জাগে এক নিবিড় ন্যাস! সে যে সব বলা-কওয়ার শেষ সেখানে!—সে যে তলিয়ে গেল, পালিয়ে গেল, হারিয়ে গেল গো,—কোন্ এক অনুভূতির অতলে!…

একজন পাণ্ডা ঠিক পিনাকের পাশেই বসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে ৺বাবার নির্ম্মাল্য দিয়া দিলেন, এবং পর পর আমাদেরও দিলেন। ঠাকুরের তখন বাহ্যজ্ঞান খানিক ফিরিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এবারে বিগ্রহ প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে পিছু হাটিয়া মন্দিরের দ্বার অতিক্রম করিলেন। মন্দিরে প্রবেশ ও সেখানে অবস্থান ও নিষ্ক্রমণ করা পর্য্যন্ত শুধু পাণ্ডারা ছাড়া বাহিরের আর একটি লোকও সেথায় ছিলেন না। যে মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আমরা বহিপ্রাঙ্গণে পৌঁছাইলাম, অমনি মন্দিরের দ্বারদেশ হইতে অভ্যন্তর পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের এক রহস্য মাহাত্ম্য!

যাহা হউক, সেখান হইতে সমস্ত মন্দিরে প্রণাম করিয়া ঠাকুর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। মন্দির পরিক্রমণকালে সর্ব্বক্ষণ আমাদের হৃদয়ে শুধু এই কথাই জাগ্রত ছিল যে—"যদ্ যদ্ দৃশ্যতে খলুসৈব গুরো।"

আর, মনে হইতেছিল—

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

—সার্থক আজিকার এই শুভদিন। দশই জুনটি স্মৃতির অক্ষয় মনিকৌটায় বাঁধিয়া নিলাম।

বিভূতিভূষণ ও মুরলীমোহনের এই শনিবার দিনটি জন্মবার; অধিকন্তু মুরলীমোহন ভাগ্যবন্ত, দশই জুন তাঁহার জন্ম তারিখ।

... ...

রাত্রি আটটা তখন। আমরা ঘরে ফিরিলাম। ঠাকুর এত ভিজিয়াছিলেন যে তাঁহার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। যাহা হউক, শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করা হইল। একটু গরম কিছু না খাইলে ক্লান্তি অপনোদন হইবে না। আর এত ঘামের পর ঠাণ্ডা লাগিয়াছে, এক্ষণে যদি ঠাণ্ডা জল খান সর্দ্দি-গর্মি হইয়া যাইবে হয়ত। শ্রীশ্রীঠাকুর চা-পান করিতে রাজি হইলেন।

ইহার পর আমরা সকলে একটি মস্ত বড় দর-দালানে সকলে একত্রিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর, পূজনীয় দাদুভাই ও ঠাকুরমাতার সঙ্গলাভ করিতে লাগিলাম। প্রায় তিনঘণ্টাব্যাপী আমাদের নানা সদালোচনা, সদালাপ ও মধ্যে মধ্যে অল্প আমোদ-প্রমোদ ও কথাবার্ত্তা কহিয়া কাটিয়া গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। —ভগবান করুণাময়, তিনি আনন্দময়। তিনি কোনদিনই জীবকে নিরানন্দে রাখেন না, রাখিতে পারেন না। জীব যত অন্যায়ই করুক তাঁহার করুণা হইতে কোনদিনই বঞ্চিত হয় না। তাহা যদি না হইত, তিনি কোনদিনই করুণাময় বা আনন্দময় হইতে পারিতেন না।

"—তিনি ?—

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো,

হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো !"

—জীব নিজ কর্ম্মফলে কষ্ট পাইয়া থাকে, শ্রীভগবান কখনও নিজে জীবকে সুখ বা দুঃখ দেন না। জীব নিজের কর্ম্মফল স্বরূপ সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, ইহাই তাঁহার জগৎ-লীলা।...জীবের দুঃখ কষ্ট অনন্ত জন্মের কর্ম্ম সংস্কার ফলে অঙ্গের ভূষণ হইয়া আছে। কিন্তু একটুখানি শুভ-কর্ম্মের ফলে করুণাময় শ্রীভগবান যখন সাধু সঙ্গে তাঁহার প্রিয় পার্শ্বচরদের সেই আনন্দ অমৃতাস্বাদনের সুযোগ কিছুক্ষণের জন্যও জীবকে দিয়া থাকেন,—কি বলিব আমরা নিজেদের বুদ্ধির দোষে নিজেদের সেই আনন্দ রসাস্বাদন হইতেও বঞ্চিত করিয়া রাখি। নিজেদের উদ্ধত অহঙ্কার লইয়া থাকিতেই আমরা ভালবাসি। ফলে, মোহবশে ক্ষুদ্র অভিমানে নিজ মনকে সন্দেহ-চঞ্চল ও সংশয়াবৃত করিয়া সাধুসঙ্গ সুখলাভ হইতেও বঞ্চিত হই।...

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা

ভবতি ভবার্ণবোত্তরণে নৌকা।"

... ...

"সাধু সঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম,

ব্রজে বাস—এই পঞ্চ সাধন প্রধান"

অত্যন্ত তমোগুণাশ্রিত ও অভিমান বদ্ধ জীব সাধুদের কি করিয়া বুঝিবে ? শ্রীভগবান সর্ব্বত্র আছেন সত্য, কিন্তু সাধুদের

হৃদয়ে, জীব সেবায়, শাস্ত্রে, মন্দিরে ও তীর্থস্থানে. নাম-যজ্ঞে, ব্রত উপবাসে, প্রার্থনায়—তাঁহার প্রকাশ মাত্রা অধিক পরিমাণ। আনন্দস্বরূপের সে জ্ঞানময় আনন্দ-পরিচয় সাধুগণ তাঁহাদের জীবনে বহন করেন। আনন্দময় সাধু সান্নিধ্যে আসিয়াও যাহারা নিরানন্দ বা ম্রিয়মাণ থাকে, ভাবি, তাহারা কত বড় ভাগ্যহীন,—সে সময়টুকুও তাহারা আনন্দময়কে ভোগ করিতে পারিল না। ইহাতো ঠিক নয়।......

—সাধুগণ কি করিলেন, না করিলেন, এদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আমি কতটুকু সাধু হইতে পারিতেছি, কতটা সাধু-সেবা করিতে পারিয়াছি, আপামর সকলকে সতত সুখী করিতে চেষ্টা করিতেছি। —এক তিনিই যে আমার সমস্ত কর্ম্মে, সকল ভাবে, বাক্যে ব্যবহারে —আচরণে সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ তৃপ্তি অনুভব করেন, সেইটুকু কি কিছু করিতে পারিতেছি,—এই চিন্তায় বুক ভরিয়া সাধুসঙ্গ করিতে পারিলে সত্যিকারের কিঞ্চিৎ অমৃত আস্বাদন করিতে পারিবে, সত্যই কিছু তৃপ্ত হইতে পারিবে। এইভাবে নিজেদের কিছুটাও প্রস্তুত করিতে চেষ্টা কর—দেখিবে, আশাতীত, স্বপ্নাতীত ফললাভ করিতে পারিবে। জীবন মধুময় হইয়া উঠিবে।—তোমাদের জাগতিক জীবনে যতকিছু দুঃখ-অশান্তি শ্রীগুরু স্বয়ং নিজে মাথায় করিয়া বহন করিবেন, এবং তোমাদিগকে ইহজীবনে ও পরজীবনে অনন্ত সুখের অধিকারী করিয়া তুলিবেন—ইহা সত্য, সত্য, সত্য।...

শ্রীভগবানের করুণা পাত্রাপাত্র বিচার করে না। তাঁহার করুণাধারা অযাচিতভাবে অজস্র ধারায় জীবশিরে অনন্তকাল

ধরিয়া প্রতিনিয়তই বর্ষিত হইতেছে। বিষয়-বিমূঢ় চিত্ত বিষয় মোহে এমনই অন্ধ যে সেই অমৃতধারা আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হইতে চায়। কিন্তু করুণাময়ের অযাচিত করুণা জীব-হৃদয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রবেশ-কাম।—ব্যর্থ হইয়াও তাহা বিমুখ হয় না। কৃপা কখনও একেবারে ফিরিয়া যায় না। আবার আসে, আবার তাহাকে ভিজাইয়া দেয়। ইহাই তিনি। যে সৌভাগ্যবান সৌভাগ্য-বতী বুঝিতে পারে, বা জানিতে চেষ্টা করে,—আমি অযোগ্য হইয়াও আমি অকৃতী হইলেও, আমি অপাত্র হইলেও অমৃত বিতরণে তাঁহার কার্পণ্য কোন দিনও নাই, যে হৃদয় সত্যই কাতর ও আর্ত্ত হইয়া গাহিতে পারে—

"ওগো ডাকিনা তোমারে
তবু তুমি আস,
চাহিনা তোমারে
তবু ভাল-বাস,
আজ জেনেছি গো মম
হৃদয় অন্তর
—তোমারি আভাতে আলো।"

—মাত্র সে-ই এই করুণামৃতে অধিকারী হইতে পারে। শুধু চোখের জল, শুধু আর্ত্তভাবে নিজেকে বুঝা, কাতর প্রার্থনা, দীন ভাবে গুরুসেবা মাত্র এই অমৃতের অধিকারী করিয়া তোলে। দুদিনের যশ, অর্থ, মান, খ্যাতি ভুলিয়া গিয়া তাঁহার শ্রীচরণে

শরণ লইয়া নিজের অন্তরের যাহা কিছু চাহিদা, যাহা কিছু লিপ্সা সমুদায় উজাড় করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে বিলাইয়া দিতে চেষ্টা কর। এক কথায় নিজের যে ভাবই থাক,—পবিত্র অপবিত্র বিচার না করিয়া নিঃশেষে নিজেকে বিলাইয়া দিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই এই অমৃতের অধিকারী হইবে। আমি জানি—আমি অপবিত্র। আমি জানি—আমি অযোগ্য। আমি জানি—আমি অপাত্র। কিন্তু তিনি তো নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সনাতন। তাঁহার কাছে তো সকলই সমান। তিনি কিছুরই অপেক্ষা করেন না, কিছুরই প্রত্যাশা করেন না। তিনি তোমাদের একটি জিনিষ চান—আমাদের ভাবের থলিটিতে যদি বিন্দুমাত্র ভালবাসা থাকে, সেই বিন্দুটিকে দিয়াও সেই সিন্ধুকে আপন বলিয়া জড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করি যদি—তাহা হইলেই তিনি আমাদের কাছে "আমি" হইয়া ধরা দিবেন। আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। শিবমস্তু।

... ...

তখনও বৃষ্টি ঝরিতেছে। কিন্তু এক্ষণে প্রকৃতি যেন কালী উন্মাদিনী। বাহিরের এই অবস্থা দেখিয়া আমরা ভাবিলাম—এই বাড়ীখানি বুঝি-বা ভাঙ্গিয়া পড়ে। আমরা ধীরে ধীরে একটি হ্যারিকেন হাতে লইয়া দ্বিতলে উঠিলাম—বাহিরের তাণ্ডব-লীলার শোভা দর্শন করিবার মানসে। উপরে উঠিয়া একটি জানালা অল্প খানিক খুলিয়া দূরে ৺নন্দনেশ্বরজিউর মন্দিরটি দেখিবার চেষ্টা করিলাম।—কিন্তু বৃথা চেষ্টা। মন্দির ত' দূরের কথা, নন্দন

পাহাড়টি পর্য্যন্ত ঐ স্থানে আছে বলিয়া মনে হইল না। সূচীভেদ্য অন্ধকার! তমিস্রা রজনীর সে এক চিত্তহারী রূপ! স্তূপীকৃত অথৈ সে অন্ধকার এতো উপভোগ্য!—নির্নিমেষে সে কালোরূপ নয়ন ভরিয়া পান করিলাম। মধ্যে মধ্যে "গুরু গুরু দেয়া ডাকে" —ক্ষণে ক্ষণে গম্ভীর মেঘ গর্জ্জন হইতেছে। আকাশ খান্ খান্ করিয়া হঠাৎ বজ্র বিদ্যুৎ সমস্ত তমো নাশ করিয়া দিগন্ত ঝল্সাইয়া ৺নন্দনেশ্বরের মন্দিরটি আমাদের দৃষ্টিপথে তুলিয়া ধরিল······

দাঁড়াইয়া আছি। দাঁড়াইয়া-ই আছি।······এমন সময় কাকুজী উপরে একটি লণ্ঠন লইয়া আসিলেন ও আমাদের সকলের শয্যা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শয্যাখানি ঠিক করিবার জন্য বিভূতিভূষণকে সঙ্গে লইয়া কার্য্যে নিরত হইলেন।

ভাবের রেশ তখনও রহিয়াছে। কাজ করিতেছি, তবু কিছুটা ভাব-বিভোর হইয়াছে মন আমার। আজ মনটায় সারাটাদিনের এত-ভাবের এত দোলা লাগিয়া আছে।—সকালের গীতা-পাঠ, দ্বিপ্রহরের উপদেশ, সন্ধ্যায় মন্দির দর্শন ও ঠাকুরের সমাধি, রাত্রির তপস্যা, সদালাপ ও পরে প্রকৃতির তাণ্ডব-দৃশ্য—একে একে চোখের সামনে ভাসিতেছে। সেই সাথে জাগিতেছে মানবীয় সম্পর্কের বিভিন্ন সম্বন্ধ-রস,—মিলন, বিরহ ও বিচ্ছেদ, শোকশান্তি, সাধু-সঙ্গ প্রভৃতি এবং ক্ষণে প্রকৃতির শান্ত সৌম্যভাব, ক্ষণে তাহার রুদ্রলীলা,—ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎঝলক, আলো-অন্ধকার ইত্যাদি ভাবিতেছি, আর মনে দোলা লাগিতেছে—

"—এক ভানু অযুত কিরণে
উজলে যেমতি সকল ভুবন,
তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা
বিচরয়ে সতীর প্রেম,
জননী হৃদয়ে করে বসতি ।"

... .

অভ্রভেদী অচল শিখর
ঘননীল সাগর বর
যেথা যাই, তুমি সেথা ।
সজন নগর বিজন গহন
যেথা যাই, তুমি সেথা ।
জলে তুমি, স্থলে তুমি,
অনলে অনিলে তুমি,
তোমাময় এই ভূমণ্ডল ।"

—সীমিত দৃষ্টিতে সত্য স্তিমিত। অখণ্ড দৃষ্টিতে—সত্য সামগ্রিক ও সর্ব্বাত্মক। ...পরম ঐক্যে বিধৃত চরম যোগ ঐক্য সূত্রটি অনন্ত, অখণ্ড, একাকার। সূত্রে মণিগণা ইব।...

"ত্বমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"...

আমরা পনের মিনিটের মধ্যে নিম্নে নামিয়া আসিলাম। ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গেই পুনরায় ভোগ-মন্দিরে পৌঁছাইলাম।

সেখানে গিয়া শুনিতে পাইলাম পূজনীয় দাদুভাই বলিতেছেন, "আজ আমি তোদের যা' কিছু রান্না হয়েছে, সে প্রসাদ পাব।" ঠাকুরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ ও এসেছে,—ওর সামনে ওর সঙ্গে বসে আমি যা' খুশী খাব, এতে কখনই শরীর খারাপ হবে না, আর, আমার অসুস্থতাও, দেখো, সেরে যাবে।"

এখানে আর একটু বলিয়া রাখি, পূজনীয় দাদুভাই আমাদের আসিবার অল্পদিন পূর্ব্বেই অম্ল-শূল বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ কষ্ট হওয়ায় চিকিৎসকদের ব্যবস্থা অনুযায়ী আহারাদি বাঁধাধরা নিয়মে চলিতেছিল। আজ আর তিনি নিয়মের অধীন থাকিতে নারাজ। আমাদের মনে হইল, এতদিন পর প্রিয় পুত্রকে কাছে পাইয়া তাঁহার আর কোন ব্যাধি থাকিতে পারে না।

ইহার পর গত রাত্রির ন্যায়ই আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের পর সকলে প্রসাদ পাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিতে গেলাম।

* * *

১১ই জুন, রবিবার। প্রাতঃকালে সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকা-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল। ঠাকুর নামিয়া আসিতেছেন।

বাহিরে গৃহ প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া দেখি, তখনও সমানভাবে ঝড়-বাদল চলিয়াছে। ভিজিতে ভিজিতে কোন রকমে প্রাতঃ-

কৃত্যাদি সমাপন করিয়া সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রাতঃপ্রণাম সমাপন করিলাম।

যে ভৃত্যটি প্রত্যহ কূপ হইতে জল তুলিয়া দেয়, সেই ভৃত্যটি এই দুর্য্যোগেব জন্য আজ আর বাড়ীর বাহির হইতে পারে নাই, তাই আজ আর জল তুলিয়া দিতে আসে নাই। আমরা এতজন ওখানে উপস্থিত—অথচ কোথাও এক বিন্দু স্নান, পান ও রন্ধনের জল নাই। "কি করে কি হবে যে"—এই কথা ভাবিয়া ঠাকুরমা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

অন্তর্যামী ঠাকুর বলিলেন, "মা, তোমাদের কোন চিন্তা নেই। আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই জল তোলার সকল ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" আমরা সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বসিলাম।

ইতিমধ্যে শুনিলাম, বহুজনের বহু সাধ্য-সাধনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আগামী কল্য হাজারিবাগে প্রত্যাবর্ত্তন বন্ধ হইয়াছে। আমরা যাঁহাকে চাই, সেই দেবস্থানে থাকিতে পাইলেই আমাদের হইল। তবে অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা এখানকার পরিবেশ মধুরতর সন্দেহ নাই।

রাধাগোবিন্দ ইতিমধ্যে কখন কিছু জল ভোগরান্নার মত অতি কষ্টে ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে নয়টা বাজিল। এইবার ঠাকুর উঠিলেন ও সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোরা সব বাইরে আয়, এই দেখ বৃষ্টি ধরেছে।" আমরা সকলে দৌড়াইয়া বাহিরে আসিলাম এবং আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম,—সেই মুষলধারা বৃষ্টি প্রায় ধরিয়া আসিয়াছে। সঙ্গে

সঙ্গে সকলে মালকোঁচা আঁটিয়া উঠানে নামিয়া পড়িলেন জল তুলিবার জন্য। আমি ও মঞ্জু-মা ঘরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। উঁহারা জল তুলিয়া আমাদের হাতে দিলেন। আমরা এক এক করিয়া ঘড়ায় জল ভরিতে লাগিলাম। তাঁহাদের নামিবার সঙ্গেই শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে বাহিরে পায়চারি করিতে লাগিলেন এবং চাতালের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "খবরদার, এক ফোঁটাও যেন বৃষ্টি না হয়।" সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম,—বৃষ্টি একেবারে ধরিয়া গিয়াছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্র তখন খানিকটা চিক্-মিক্ করিতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বলিলেন,—"তোবা সবাই কিছু কিছু ক'রে এবারে তাড়াতাড়ি জল তুলে নে। তোরা যতক্ষণ জল তুলবি, ততক্ষণ এক ফোঁটাও বৃষ্টি হবে না। তোদেরও জল তোলা শেষ হবে, আর মুষলধারে বৃষ্টি হবে। খুব শীঘ্র শীঘ্র জল তুলবি তোরা।"

ছেলেরা সকলে মহানন্দে হৈ হৈ করিয়া জল তুলিলেন। পনের মিনিটের মধ্যে সকল জল তোলা হইয়া গেল। যতক্ষণ জল তোলা হইতেছিল শ্রীশ্রীঠাকুর বাহিরের রোয়াকের দিকে পায়চারি করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে আকাশের দিকে তাকাইতেছিলেন। কি আশ্চর্য্য! রাধাগোবিন্দ শেষ বালতির জল ভিতরে আনিতে না আনিতেই আবার প্রবল বর্ষণ সুরু হইল! জল তুলিবার পূর্ব্বে যেরূপ বৃষ্টি হইতেছিল, তাহার চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল।

... ...

এই প্রকারের ঘটনা একবার নহে, বহুবারই বহু ভক্তের কত অসুবিধা দূর করিয়াছে। কী অদৃশ্য শক্তি সহায়ে তিনি এই বৃষ্টি বাঁধিয়াছেন ও বৃষ্টি নামাইয়াছেন, তিনিই জানেন। জয় গুরু।

... ...

ইহারপর অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও স্নান, ভোগ ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক সকল নিয়মিত কার্য্য সমাপন হইল।

এইখানে একটি কথা লিখি। ভোগের পর একটি গুরু-ভাই আজ পাঁচ বৎসর পর এই দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে আসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, শুনিতে পাইলাম, "ঠাকুর, আজ এই বৃষ্টি প্রাণপণ চেষ্টা করছিল যাতে আমি আপনার কাছে না আসতে পারি। দুর্দ্দিনকে দোষারূপ করলাম। বললাম—হায় রে বাদলধারা! তুইও বাধা দিবি আমার ঠাকুর দর্শনে? বৃথা, আজ আর কোন বাধা আমি মানবো না। আমি যে করেই হোক আজ যাবোই।"

শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হাসিলেন। বলিলেন "বস, বাবা।" কুশল প্রশ্নাদির পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুর্দ্দিন কাকে বলে, বল দিকিন?"

নিজেই উত্তর দিয়া চলিলেন ঠাকুর—

"তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে, মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্,
যদ্দিনং ঈশসংলাপ কথা পীযুষবর্জ্জিতম্।"

—"ওরে, বাদলা দিন দুর্দ্দিন নয়। বাইরেকার বাধা-বিপত্তিতে ভরা ঝড়-ঝঞ্ঝায় পাগল-পারা দিনগুলি দুর্দ্দিন নয়। দুর্দ্দিন তাকেই

যেন ভাবতে পারি, অভাবে আর্ত্তনাদে হারা বিষয়াসক্ত যে দিনটায় সৎসঙ্গ আমাদের সার হয়ে উঠলো না, আমাদের প্রিয়-প্রসঙ্গে সদালোচনায় দিনটা কাটলোনা, সৎচিন্তায়, সৎকার্য্যে আমাদের তন্-মন্ দিনভর আচ্ছন্ন রইলো না!...

প্রশ্ন করিলেন ভক্ত—"জীবের কাম্য কি?"

ঠাকুর উত্তর দিলেন, "মনুষ্যত্ব লাভ করা।"

প্রঃ—"মনুষ্যত্ব কি?"

উঃ—"মনের উপর ঈশিত্ব বা প্রভুত্ব করা, মনু হওয়া।"

প্রঃ—কি উপায়ে মনুষ্যত্ব লাভ হয়?

উঃ—গুরুসঙ্গ ও সেবা দ্বারা। সেবা অর্থ গুরুর উপদেশ যথাযথ পালন করা। সেবা দ্বারা গুরু লাভ হয়। গুরুর প্রতি অনসূয়া হতে হবে, না হলে গুরু সেবা হতে পারে না। অনসূয়া মানে—অসূয়া শূন্যতা, অর্থাৎ গুরুর কোন দোষ না দেখা। গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি না এনে ভগবদ্‌বুদ্ধি আনতে হবে, নতুবা অসূয়া শূন্য হওয়া সম্ভব নয়। যখনি গুরুর বুকে কোন ইচ্ছা জাগবে, তখনি সব ফেলে সেটা করা উচিত। একেই যথার্থ আদেশ পালন করা বলে। গুরু যখন তোমার শত্রু নন, তখন তিনি যা' বলবেন তাতে তোমার উপকারই হবে। সুতরাং তা' পালন করাই উচিত—এতে যা হয়—হোক্, এই ভাব মনে থাকবে। নিজ কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি থাকতে এই সেবা সম্ভব নয়। সব কিছুই ত্যাগ করা যায়, শুধু কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধিটুকু কিছুতেই ছাড়া যায় না।

সাধন জগতে যে কেহ বড় হয়েছেন, তিনি কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি ছেড়েই তা' হয়েছেন।"

প্রঃ—"বকলমা দেওয়া অর্থে কি বোঝায়, বাবা?"

উঃ—"সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করা। কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধির একেবারে মুণ্ডপাত, পিণ্ডি নাশ। আমি কিছু করি না, সব তিনিই—এই বুদ্ধি।"

প্রঃ—কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি ছাড়ার উপায় কি?"

উঃ—"আমরা চাই—ঠাকুর আমাদের মনের মত হোন্। কিন্তু সেটা না হয়ে, 'আমি তাঁর মনের মতন হই'—এইরূপ চেষ্টা করতে করতে কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি ক্রমে চলে যায়। একটু তাঁর মনের মত হলে দেখা যায় তিনি কতটা আমার হয়েছেন—এত দয়াল তিনি। আমরা ত' ঠাকুরের জন্যে, ভগবানের জন্যে' ভগবানকে চাই না—আমরা চাই আমাদের মনের কাম কামনার, বিষয় বাসনার পরিপূরণ হোক্।"

প্রঃ "মনের মত হবার উপায় কি?

উঃ—তাঁর মনের মত হতে হ'লে তাঁর স্থূল-সঙ্গ করা প্রয়োজন। মধ্যে মধ্যে গুরু-সঙ্গ করলে বাসাটা—অর্থাৎ যেখানে গুরুকে বসাবে, তোমার অতি আপন জনকে বসাবে, সেটি ভাল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

প্রঃ—"গুরুর কি ইচ্ছা কেমন করে জানবো?

উঃ—"একনিষ্ঠ সেবক হওয়া প্রয়োজন। মনে গুরু ছাড়া অন্য কোন চিন্তা না থাকলে, এই ভাব আসে। নিজের শরীরটা

দিয়েই এটা বুঝে নাও। ক্ষুধা পেলে যেমন অনুভব হয়, গুরুর প্রত্যেক ইচ্ছাও তখন এইরূপ অনুভব হয়। তোমার নিজের হয়ত কোন প্রয়োজন নাই, তবুও কোন জিনিষ হয়তো কেবলি মনে হচ্ছে,—দেখবে সেটা তারই প্রয়োজন হয়েছে। গুরু যে আমাদের কত আপন' সেই বোধটাই আমাদের বুকে আসেনা, হৃদয়ে জাগে না। ভালবাসার একান্ত অভাব—তাই হয় না। সাধারণ লোকের ভালবাসা টাকার উপর। একেই আসক্তি বলা যায়। এই আসক্তি ভগবানের উপর হলে, তাকে বলে অনুরাগ। সে অনুরাগে অন্ধকার দূরে যায়।

"কেবল অনুরাগে তুমি কেনা
প্রভু, বিনে অনুরাগ করে যজ্ঞ-যাগ
তোমারে কি যায় কেনা ?"

তবেই বুঝলে ত'—গুরুর প্রতি আসক্ত হতে হবে। সেই গুরুই হল তত্ত্ব-জ্ঞান।"

প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত আলোচনা করিয়া গুরুভাইটি ফিরিয়া গেলেন।

ইহার পর আমাদের চা-পান ইত্যাদির পর্ব্ব শেষ করিয়া বৈকালিক ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আজ ঠাকুরের নূতন পরিধেয় বস্ত্র। গতকল্য যে বস্ত্রাদি পরিধানে ছিল তাহা আর্দ্র ও স্বেদ-সিক্ত ছিল, আজ আর তাহা পরিধানের উপযোগী ছিল না।

আকাশের দিকে চাহিয়া দেখি,—ও মা! আজও আবার দিগন্ত ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছে। বাহির হইবার আগ্রহাতিশয্যে মন যতই তোলপাড় করে, আকাশেরও তোড় জোড় যেন সমভাবেই আগুয়ান। বর্ষণ চলিয়াছে প্রায় অবিশ্রান্ত। বারিধারা যেন পাগল পারা উচ্ছ্বসিত দারোয়া নদী কূলে কূলে পূর্ণ। প্রলয়-নাচন—৺বৈদ্যনাথ ধামকে যেন প্লাবিত করিতে প্রচেষ্টা। আজ আর প্রাঙ্গণে অপরাহ্ণে স্নান করিবার মত অবস্থা নাই। অল্পক্ষণ মধ্যে আমরা সকলে যথাযথ প্রস্তুত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "দেখছ, আজ আর বাড়ী থেকে বেরুবার উপায় নেই। তোমরা এখানে বস।"

আমরা বসিয়া পড়িলাম।

নানারূপ সদালোচনা হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দাদুভাই ঠাকুরমাকে লইয়া আনন্দ উপভোগ-ও করিতে লাগিলাম।

পূর্ব্বোক্ত সেই শোকাতুরা রমণীর কিছু শোক শান্তি করিবার উদ্দেশ্যেই কি আজ এই ব্যবস্থা—কে জানে! শ্রীশ্রীঠাকুর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একটি তাকিয়া পিঠের দিকে রাখিয়া যখন বসিয়াছিলেন, এই রমণী ঠাকুরের নিকট বসিয়া শ্রীপদ সেবা করিতে করিতে ও মধ্যে মধ্যে পাখার মৃদু বাতাস দিতে দিতে নানা প্রশ্ন করিয়া শান্তি সোয়াস্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই দুই দিনেই তাঁহার মন অনেকখানি শান্ত হইয়াছে, দুঃসহ পুত্র-বিয়োগ বেদনার ক্রমে উপশম

হইতেছে। আজ আর শোক-বিহ্বলা শোককে জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে না। আগামীকাল সোমবার আমাদের যাওয়া হইবে না—ইহাতেই ইঁহার শোক যেন কিঞ্চিৎ স্তিমিত প্রশমিত হইয়াছে। বারবারই বলিতেছেন, "বড়দা, আমার জন্যেই আপনি এখানে এসেছেন, কি ক'রে আপনি এত শীঘ্র চলে যেতেন!"

সত্যিই তো। ব্যথাহারী পতিতপাবন তাপী-তারণ শান্তি-ময়—শান্তিদাতা! কত শোককাতরা জননীর শোক হরণ—কত আর্ত্তজীবের কত দুঃখ-জ্বালা, কত ব্যথা-বেদনা, শোক, অশান্তি,—সকলের বিবিধ অভাব, অভিযোগ ও যন্ত্রণা-পীড়ন বুক পেতে নিতেই তো ইঁহার আবির্ভাব।

কত দেখিলাম, কত শুনিলাম!—কত পিতা-মাতা সন্তান হারা হইয়াছেন, কত নর-নারী পতি-পত্নীহীনা হইয়াছেন, কত ধনী নিঃস্ব-রিক্ত হইয়াছেন, কত বলিষ্ঠ-দেহ ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন, "কাঞ্চন কি কাম কিম্বা যশঃ আশ"—কত সজ্জনকে স্বভাব-ভ্রষ্ট নীতিচ্যুত করিয়াছে, বিবেক-দংশনে জর্জ্জরিত করিয়াছে, কত জিজ্ঞাসু যুযুৎসু নওজোয়ান সংশয়-দোলায় খাবি খাইয়াছেন, কত পণ্ডিত ও পুস্তক-কীট, কত পদ ও পদবীধারী শিক্ষাভিমানী, কত মানী-জ্ঞানী-গুণী-অহঙ্কারী জীবন যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত—অপঘাতে ক্লান্ত শ্রান্ত পরাজিত হইয়াছেন,—কিন্তু, যাঁহারাই ইঁহার সান্নিধ্যে সংস্পর্শে আসিয়াছেন, শ্রীচরণে আশ্রয় লইয়াছেন, কোন যুক্তি যাদুস্পর্শে ও নব অনুপ্রেরণায় তাঁহারা সঞ্জীবিত হইতেছেন, শুভবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নব-

জীবনের বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতেছেন, ব্যক্তিক ও সাঙ্ঘিক সকল কর্ম্ম প্রচেষ্টায় উন্নততর মানসিকতা ও মনোবলের পরিচয় প্রতি মুহূর্ত্তে দিতেছেন, মানব প্রগতি রচনা করিতেছেন। কোথায় বিলীন হইয়া যায় সকল শোক-দুঃখ, জড়া-তাপ, ভোগ-রোগ, শুষ্ক তার্কিকতা, গর্ব্ব-মান-অভিমান, বংশ আভিজাত্য, অসৎ-বৃত্তি, অনাচার,অতি-আচার, অহঙ্কার! জীবনে জীবনে পড়ে যায় জয়-জয়কার।

যিনি যাহা চাহেন, তাঁহার সে সাধ ইনি পূর্ণ করিয়া রূপান্তরিত করেন। এই পূর্ণ-করণ ও রূপান্তরের মধ্যে একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা আছে। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগে মনের সুপ্ত মগ্নচৈতন্য হইতে সুরু করিয়া ক্রমে অর্দ্ধ জাগ্রত ও সদা জাগ্রত চৈতন্য সত্তায় জাগ্রত মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনুষ্যত্বের স্ব-মহিমায় প্রকাশিত করাই জীবন্মুক্তি। সে মুক্তি ব্যক্তিক ও সাঙ্ঘিক প্রচেষ্টায়! দিশারী শ্রীগুরু স্বয়ং।

তাই যিনি যাহা চাহেন, তাঁহাকে প্রথমে তাহাই তিনি দিতেছেন। ক্রমে সাধনচর্য্যায় দেখা যায়, সেই চাহিদা স্থানের সবখানিটা তিনি ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া পরা-জ্ঞান ঢালিয়া অপরা প্রেয়কে এমনিভাবে জুড়িয়া দেন যে আগন্তুক পূর্ব্বাহ্নে যাহা চাহিয়া ছিলেন সেটা পর্য্যন্ত তাঁহার বিস্মরণ-পথে বিলীন হইয়া যায়! তখন যদি সেই প্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করা যায়, "আপনি এর কাছে প্রথমটায় কেন এসেছিলেন, কি চেয়েছিলেন," তখন তাহার উত্তর দিবার-ও যেন প্রবৃত্তি হয়

না, যেন সামর্থ্য-ও রয় না, সে অতীত কথা কয় না। তাঁহার উত্তর দিবার স্থানটি পর্য্যন্ত জ্ঞানামৃত দিয়া নিঃশ্রেয়স দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া প্রেম-ঘন মঙ্গলাপ্লুত নয়ন দু'টিতে মৃদু হাসিয়া জানাইয়া দেন যেন—"ওরে শুধু তিনি, শুধু তাঁর,—'সেথা তুমি-আমি একাকার,—মাঝে আর নাই, কিছু নাই,—কেহ নাই।"......

এই সকল চিন্তায় আমরা বিভোর! হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিভূতি, কি ভাবছিস? এত চুপ চাপ যে, তুইতো এতো চুপ করে থাকার ছেলে নোস্! ব্যাপার কি?" সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে বিভূতির ভাব হচ্ছে রে।" এই কথা শুনিয়া সকলে বিভূতির দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলাম। বেহুঁস বিভূতিভূষণ মহালজ্জিত হইয়া মুখখানি লুকাইবার চেষ্টায় আমার পশ্চাতে আশ্রয় লইলেন।

ইহার পর রাত্রে বিশেষ কোন ঘটনা হয় নাই। অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও নিয়মিত সকল কর্ম্ম শেষ হইলে শ্রীচরণে বিদায় লইয়া আমরা শুইয়া পড়িলাম। তখনও বাহিরে বৃষ্টি ঝরিতেছে, অবিশ্রান্ত গতিতে ক্লান্তিহীন ঝড় বৃষ্টি একই ভাবে চলিয়াছে।

* * * *

আজ সোমবার, ১২ই জুন। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঝড় ও বৃষ্টি সমভাবেই চলিয়াছে। আজিকার দিনটি ও দেখছি ঘরে বসিয়াই কাটিবে। অন্যান্য দিনের ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের

শয্যাত্যাগের পর যথাক্রমে প্রাত্যহিক ব্যবস্থানুযায়ী আজও সকল কার্য্য চলিতে লাগিল। এইরূপে নয়টা পর্য্যন্ত চলিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশমত বিভূতিভূষণ ও কাকুজী বাজারে গিয়া কিছু বাজার করিয়া এবং বৈকাল চারিটার সময় হাজির হইবার জন্য একখানি ষ্টেশন ওয়াগন ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন। নয়টা হইতে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত কিন্তু আকাশটা থম্‌থমে হইয়া রহিল। বিভূতিভূষণ ও কাকুজী ফিরিয়া আসিলে পুনরায় বারিপাত আরম্ভ হইল।

প্রতিদিনের ন্যায় আজও ৺শালগ্রামজিউর পূজা, ভোগারতি হইল। পরে পূজক দাদুভাই ও শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসাদ পাইলে আমরা সকলে নিয়মমত পরের পর প্রাত্যহিক সকল কর্ম্ম সমাধা করিয়া দ্বিতল কক্ষে উপনীত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সদালোচনায় তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল।

আলোচনার সারাংশ নিম্নে দিতেছি—

—বাহিরের বিষয় তাহার কঠোর আবেষ্টনীর মধ্যে ঘিরিয়া চাপিয়া ধরিয়া, তাহার সমস্ত তেজ ও প্রভাব প্রয়োগ করিয়া শুকাইয়া দিতে পারে মানুষের উপরের কাঠামোটাকেই। সে সঙ্গে অবশ্য সেই তেজ তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিঃশেষ করিতে প্রচেষ্ট হয় মানুষের বাহিরের ভাব সম্পদকেও। ফলে বহির্বিষয়াসক্ত জীব ত্রস্ত শঙ্কিত হইয়া পড়ে তাহার অদূর ভবিষ্যতের চিন্তায়। কিন্তু ভিতরগুলি যাহাদের ভিতরের বিষয়-রসে সিঞ্চিত হইয়া উঠে, এবং প্রিয়তম পিতার প্রেমরস বিন্দু

বিন্দু পান করিয়া অভিসিঞ্চিত হইতে থাকে অহরহ,—তাহারা তাঁহার ঐ অমৃত-সিঞ্চনী রসশক্তির দ্বারা আবার সতেজ সজীব করিয়া তুলিবার প্রয়াস পায়—বাহিরের কাঠামোটাকেও তাহাদের।

—তাই বলি বাবা, বাহিরের দিকটা যতই কঠোর হউক, শুষ্ক হউক, তিক্ত হউক সেদিক লক্ষ্য না রাখিয়া তোমার অন্তরোদ্যান যাহাতে আনন্দ-কুসুম, আনন্দ-পারিজাত পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠে, সেই পারিজাত লতাবৃক্ষ যাহাতে পরম পিতার আনন্দ রস তথা প্রেমরস সিঞ্চনে সঞ্জীবিত হইয়া ধীরে ধীরে তাহার শাখা. প্রশাখা বিস্তার করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে,—সে বিষয়ে প্রয়াসী হওয়া কর্ত্তব্য।

—বহু অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ও দেখিয়াছি। তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের সায়াহ্নে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মজদের মোহ-নীড় হইতে নিজেদের এক প্রকার বিচ্ছিন্ন করিয়াই শাস্ত্র কথিত বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিয়া শ্রীগুরু বিশ্বনাথের শ্রীচরণ সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিজয়ী কাম সেখানেও তাঁহার অঙ্গসঙ্গিনী মোহকে লইয়া তীর্থ-বাসিন্দা ঐ পবিত্র বৃদ্ধ দম্পতীদিগের মন ও বুদ্ধি গুলিকেও বাদ দেয় নাই। তীর্থস্থানে আসিয়াও তাঁহারা বিব্রত হন। কাম ও মোহ তখনও যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াই আছে। সেখানে সেই সব বৃদ্ধ দম্পতীরও পরাজয় কোনদিনই সম্ভব নয়, যদি সেখানে সেই যুদ্ধে তাঁহারা সেনাপতি করেন শ্রীগুরু

আশুতোষকে। দুরন্ত কাম, দুর্দ্ধর্ষ কাম প্রভৃতি বিজয়ী কাম তাঁহার অক্ষয় তূণ হইতে অশ্বত্থামার ন্যায় যতই না সংস্কারের বাণ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন, শ্রীগুরু আশ্রিত দম্পতী যুগলদের কাম তাহার অঙ্গসঙ্গিনী মোহকে সহ তাঁহাদের মোহনিদ্রায় অভিভূত করিবার জন্য যতই প্রচেষ্ট হইয়াছে—শ্রীগুরু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ করুণাবলে তাঁহার আশ্রিতদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিজেই তাঁহাদের হৃদয় দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিটি নিক্ষিপ্ত শরই ভক্ষণ করেন।—এই পাষাণ ভিক্ষুক দূরে দাঁড়াইয়া এমন কতই দেখিতেছে আর আনন্দে "জয় গুরু" "জয় গুরু" বলিয়া হাতে তালি দিয়া নাচিতেছে—এই কারণেই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কাম মোহ সহায়ে যতই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠুক না কেন, সাধন সমরে তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, কারণ "যতোধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।"

—যেখানে শিব, অশিবনাশ সেখানে হবেই হবে। শিবমস্তু।



৺কুণ্ডেশ্বরী মন্দিরে

এইবার আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া আসিয়াছে। বৈকালে সকলে মিলিয়া পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরীমাতার মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে চলিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরও বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। গাড়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হইল। এইবার সকলের ছুটাছুটির পালা। ঠাকুর সকলকে তাগাদা দিতে লাগিলেন। আমরা অতি তৎপরতার সহিত উপস্থিত হইলাম। এইবার একে একে সকলে গাড়ীতে উঠিলাম। বাড়ীতে একাকী রহিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ। তাঁহার ৺শালগ্রামটিকে লইয়া তিনি তাঁহার সাধন মন্দিরে বসিলেন। আমরা যতক্ষণ বাহিরে থাকিব —হয়ত সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে—এই ভাবিয়া পূজনীয় দাদু-ভায়ের সন্ধ্যাপূজা ও আরতির যাবতীয় পূজার সামগ্রী সাজাইয়া দিয়াই ঠাকুরমা আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সকলকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া স্বয়ং সারথীর পাশে উপবেশন করিলেন। আদেশ পাইবা মাত্র গাড়ীখানি সকলকে বুকে লইয়া ৺মাতৃ মন্দির উদ্দেশ্যে চলিতে আরম্ভ করিল।

আমি প্রস্তাব করিলাম—"আমরা কিন্তু এবারে পতাকা-সঙ্গীত ধরবো।" সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সকলে পরমোৎসাহে

আনন্দিত চিত্তে "শ্রীগুরু পতাকা পূতা" মিলিত কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে চলিলাম। কোথা দিয়া সময় চলিয়া গেল—অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। হঠাৎ দেখি প্রায় ৺কুণ্ডেশ্বরীমাতার মন্দিরের কাছাকাছি আসিয়াছি। আর একটু পরে একটি বাঁক, তারপর মন্দিরের চূড়াটি আমাদের দৃষ্টি গোচর হইল। মন্দিরের সিংহ-দরজায় আমাদের গাড়ীখানি ধীরে থামিয়া গেল। গাড়ীর সম্মুখের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিল ড্রাইভার—পিছনের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন বিভূতিভূষণ। একে একে গাড়ী হইতে সকলে অবতরণ করিলেন। পাদুকাগুলি সকলে গাড়ীর ভিতরে রাখিয়া আসিলেন।

চলিলাম সকলে ৺কুণ্ডেশ্বরী মাতার মন্দিরে যেখানে শতভক্ত-পদচিহ্ন পড়িয়া বহু রেখা অঙ্কিত হইয়াছে বহু বর্ষ ধরিয়া। সেই পদচিহ্ন ধরিয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরু ভগবানের সঙ্গে আমরাও মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। মন্দির-সোপান নিম্নে মস্তক স্পর্শ করিয়া শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরীমাতার উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম নিবেদন করিবার চেষ্টা করিলাম। পরে সোপানোপরি শ্রীশ্রীঠাকুরের পশ্চাদনুসরণ করিয়া পূজনীয়া ঠাকুরমাতার সঙ্গে মন্দিরের বাহিরের দালানটিতে প্রবেশ করিলাম। জগজ্জননী উজ্জ্বলময়ী সিংহবাহিনী মাতৃমূর্ত্তি স্থির নেত্রে দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃচরণে দণ্ডবৎ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

আমরা সকলে ঠাকুরের চতুষ্পার্শ্বে জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া এতক্ষণ ঠাকুরকেই দর্শন করিতেছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের

প্রণামান্তে আমরা ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিলাম। মনে হইল ঠাকুরের পদরজঃ আমাদের শিরে আমরা তুলিয়া লইলাম। প্রণাম সারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলাম শ্রীশ্রীঠাকুর সোপানে অবতরণ করিয়া সম্মুখস্থিত শিব-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আমরা জানি, ঠাকুর সকল সময় একভাবে থাকেন না। কখন কোথায় কি ভাবের উদয় হইবে বলা যায় না। যদি ভাবভর সামলাইতে না পারেন, হয়ত শ্রীঅঙ্গ কোথাও পতিত হইয়া ব্যথা পাইবেন। কাজেই বিভূতিভূষণ ও মুরলী-মোহন—দেহরক্ষীদ্বয় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিলেন।

শিব মন্দিরে পৌঁছাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে যুক্ত করে শিবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে করিতে ভাব বিভোর হইয়া পড়িলেন। নয়ন যুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইল, ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল, অস্ফুট আর্ত্তি কি যেন কি কথা দেবাদিদেবের উদ্দেশ্যে আকুতি নিবেদন করিল। পরে দেব দণ্ডবৎ হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া অন্তর বিগলিত একটি প্রণাম জানাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার মন্দির সংলগ্ন নবগ্রহ মন্দির দর্শন করিতে চলিলেন। দুই ভাই তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। সে মন্দিরে উঁহাদের অধিক বিলম্ব হয় নাই। এখানকার প্রণাম শ্রীশ্রীঠাকুর অল্প সময়ের মধ্যে সারিয়া যেন কি এক ভাবে উদ্বেল হইয়া কাঁহার উদাত্ত আহ্বানে অতি তৎপরতার সহিত পুনরায় ৺সিংহবাহিনী কুণ্ডেশ্বরীর মন্দিরে উতলাচিত্তে উপস্থিত

হইলেন। এবারে ঠাকুর বাহিরের দালানে দাঁড়াইলেন না, ৺মায়ের গর্ভ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আমরা দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিতে লাগিলাম।

এইবার দেখিলাম—শিবমন্দিরে যাইবার পূর্ব্বে সতীরাণী সিংহবাহিনী যে সোহাগটুকু তাঁহার আদরের দুলালকে দেন নাই, যেন তাহা এইবার দ্বিগুণভাবে উজাড় করিয়া ঢালিতেছেন। কি সুন্দর, কি চমৎকার! মনে হইল, "মাগো, মন্দিরে প্রবেশ করেই তো তোমার নয়নমণি আগেই ছুটে এসেছিলেন তোমারই কাছে, তুমি যে তখন তাঁকে এতটা করনি। তখনও তাঁর পরম পিতার মন্দিরে ৺পিতার সাথে দেখা হয়নি—এই কি কারণ? এইবার ৺পিতৃচরণ বন্দনা করে ৺মায়ের কাছে ফিরে আসতেই,—স্নেহময়ী জননী তুমি, তাঁকে কোলে তুলে নিলে,—নিয়ে কি সোহাগেই না তাঁকে ভরে দিচ্ছ, মা!" কি মধুর দেখাইতেছে শ্রীমুখখানি! চোখ দুইটির ভার—যেন পাঁচ বৎসরের বালক! ওষ্ঠাধর অল্প কাঁপিতেছে। মধ্যে মধ্যে মধুর কণ্ঠে "মা", "মা" ধ্বনি উত্থিত হইতেছে।"

"উত্তিষ্ঠ মাতঃ সগুণৈঃ মহিম্না,
পুত্রান্ প্রবুদ্ধান্ কুরু নিজ শক্ত্যা।"

—কি যেন আব্দার ছেলের আজ ৺মায়ের কাছে। এই দৃশ্য মন্দিরের পুরোহিত-ও দাঁড়াইয়া অবাক বিস্ময়ে অপলক নেত্রে দেখিতেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বিগলিত চিত্তে অশ্রুসিক্ত

নয়নে হৃদয়ে হৃদয়ে ঝঙ্কার তুলিয়া কম্পিত কণ্ঠে গদ গদ ভাবে ৺মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাইতেছেন—

"ওঁ জগদ্ধাত্রী! জগৎ-কর্ত্রী! জগতাং পরিপালিকে।
অতি দীনং মতি হীনং পাহি মাং দেবি ত্রিপুরে॥
জপ পূজাং ন জানামি! নাস্তিমে তপসঃ ফলম্।
ত্রিপুরে এ্যক্ষরং মন্ত্রং কেবলং মম সম্বলং।
পাপ তাপ দগ্ধ দেহং নিরালম্বং নিরাশ্রয়ং।
—দেহি মে চণ্ডিকা মাতঃ শ্রীপাদ পঙ্কজদ্বয়ং॥
কিং করোমি কুত্রো যামি দেহান্তে কা দশা মম।
ইতি চিন্তা ব্যাকুলোঽহং মহাপাপ নরাধম॥
মাত্রা চিৎ দয়া মাতঃ যদি তে সম্ভবিষ্যতি।
নিস্তার কারণং তদ্ধি ত্বমেকা মে পরাগতিঃ॥
পুত্রা পরা ধাতা মাতা কদাচিৎ যদি কুঃ পতি।
ক্ষমা প্রার্থনা মাত্রেণ স্বাঙ্কে স্থানং প্রযচ্ছতি।
জগতাং জননী ত্বং ভো! দয়াময়ী ক্ষমাবতী।
মূঢ় পুত্রস্যাপরাধং ক্ষমা কিং নো ভবিষ্যতি॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণতো ভূত্বা যাচেঽহং কাতরস্বরে।
—ক্ষমস্ব মম পাপানি, রক্ষ মাং চরণোত্তরে।

দুই গণ্ড বাহিয়া ঝর ঝর ধারায় অশ্রুজল ঝরিতেছে। আমরা ভাবিতেছি—জ্ঞানদ শান্তিদ শ্রীঠাকুর, শারদ মুক্তিদ, মোক্ষদ শ্রীগুরুদেব আপনারই দয়াময়ী মাতৃরূপের কাছে আপনার

শরণার্থী সন্তান-রূপের পূর্ণ আত্মসমর্পণ জানাইতেছেন,—আপনার পূজা আপনিই করিতেছেন আত্মহারা ভাবে।

প্রার্থনান্তে ঠাকুর প্রণাম জানাইতেছেন—

"জয়দে জগদানন্দে জগদেক প্রপূজিতে।
জয় সর্ব্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥"

তারপর ভোলানাথ আত্মভোলা হইয়া ধ্যান মগ্ন রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রার্থনা-প্রণাম সারিয়া উত্তরীয় দ্বারা অশ্রু মুছিতে মুছিতে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠিয়া আসিলেন।

এতক্ষণ আমাদের সঙ্গের সাথীরা যথাযথ দর্শন প্রণাম সারিয়া মন্দির পার্শ্বস্থিত একটি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এইবার সকলে একসাথে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় অপেক্ষমান গাড়ীখানিতে উঠিয়া বসিলাম। পূর্ব্বে ভাইদের ইচ্ছা ছিল একটু বাজার দিয়া ঘুরিয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন, এবং সন্ধ্যার পর পুনরায় ৺বৈদ্যনাথের শৃঙ্গারবেশ দর্শন। কিন্তু গাড়ী চলিতে সুরু করিলে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "আজ আর বাজারের দিকে যেয়ে কাজ নেই, সন্ধ্যার সময় মন্দিরে এলেই হবে।" ইহা শুনিয়া মঞ্জু-মা আব্দার ধরিলেন, "বাবু, তা, হলে বালানন্দ আশ্রমে যুগল মন্দির দেখতে যেতে হবে কিন্তু।" ঠাকুর রাজি হইলেন। যুগল মন্দির দেখাইতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সকলকে লইয়া বালানন্দ আশ্রমে পৌঁছাইলেন। এস্থানে আমাদের অধিক সময় লাগিল না। মন্দিরটি মাত্র কয়েক বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারুকার্য্য অতি চমৎকার। দুইটি মন্দির

একটিতে সিংহাসনোপরি বালানন্দ স্বামীর প্রতিকৃতি, অপরটিতে বালগোপাল মুর্ত্তি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। দর্শন, প্রণাম ও মন্দির পরিক্রমণ করিয়া ঠাকুর নীচে নামিয়া আসিলেন। আমরাও সাথে সাথে চলিয়া আসিলাম, ও মোটর অভিমুখে রওনা হইলাম।

এইবার বাড়ী ফিরিবার পালা। সকলে মোটরে উঠিতেই শ্রীশ্রীঠাকুর ড্রাইভারকে বলিলেন "বাজারকে তরফ চলো ভাইয়া।" বুঝিলাম—তবে বাজারে যাওয়া হইবে। অল্পক্ষণে আমরা বাজারে আসিয়া পৌঁছাইলাম। গাড়ীখানি একটি লোহার দোকানের সামনে দাঁড় করান হইল। আমরা সকলেই সেই স্থানে নামিয়া পড়িলাম। পরে লোহার দোকান হইতে ছোট, বড়, মাঝারি মানের তিনখানি কড়া, একখানি তাওয়া কেনা হইল। এগুলি আমাদের আশ্রমের জন্য। ঠাকুরমা আমাকে বলিলেন, "একটি ভাল দেখে সাঁড়াশি বেছে আমার জন্যে কেনত, মা।" অনেকগুলি সাঁড়াশি বাছিয়া একটি আমি ঠাকুরমার হাতে তুলিয়া দিলাম। পরে আর একটি দোকানে সকলে চলিলাম। সেখানে দুখানি বঁটি কেনা হইল। দোকানটির নাম দেখিলাম, "শ্রীগুরু ভাণ্ডার।" নাম দেখিয়া ভাল লাগিল। এবারে বাকী রহিল আমাদের "শ্রীগুরু আশ্রমে"র জন্য একখানি কাঁসর কেনা। কাঁসর কিনিতে বেশি সময় লাগিল না। কাছেই একটি দোকান হইতে গুরু-গম্ভীর আওয়াজের মস্ত বড় এক কাঁসর শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে পছন্দ করিয়া

কিনিয়া দিলেন। আর কোন জিনিষ লইবার নাই। সুতরাং সকলে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। ড্রাইভারের পাশে বসিয়া ঠাকুর আদেশ দিলেন "আভি সিধা কুঠীপর চলো।" ড্রাইভারও সশব্দে মোটরখানি গৃহাভিমুখে চালাইয়া দিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই আমাদের গাড়ীখানি গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে একে একে নামিয়া আসিয়া দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহোদরা,—পূজনীয় দাদুভাইকে সম্বোধন করিয়া ডাকিয়া দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিলেন। ভিতর হইতে দ্বার অর্গল বদ্ধ করিয়া দাদুভাই বোধহয় সন্ধ্যারতি সারিয়া সবে মাত্র দরদালানস্থিত কেদারাখানিতে বসিবার উপক্রম করিতে-ছিলেন। আমাদের সাড়া পাইয়া তিনি অতি সত্বর ব্যস্ত হইয়া আসিয়া রুদ্ধ দ্বার অর্গল মুক্ত করিলেন, এবং বাহিরের দালানে আসিয়া ধাপির উপর বসিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আমরা সকলে আর ভিতরে প্রবেশ না করিয়া সেই স্থানে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় লইলাম। ঠাকুর বলিলেন "আজ আর ৺বৈদ্যনাথ দর্শন না-ই বা হলো।"

আমরা সকলে বসিয়া আছি, হঠাৎ মুরলীমোহন একটি কৌটায় করিয়া সুগন্ধি জর্দ্দা বাহির করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রদান করিলেন ও বলিলেন, "দাদুভায়ের জন্যে এইটি এনেছি।" এক্ষণে মনে হইল,—কাঁসর কেনার পর গাড়ীতে উঠিবার প্রাক্কালে বাজারের দিকে তখন চাহিয়া দেখি, মুরলী-

মোহন একটি দোকান হইতে বাহির হইয়া লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া শশব্যস্তভাবে আমাদের দিকে আসিতেছিলেন। যাহা হউক, ঠাকুর জর্দ্দার কৌটাটি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন ও আনন্দিত চিত্তে উহা দাদুভায়ের হস্তে প্রদান করিলেন। দাদুভাই জর্দ্দা পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন "এর মূল্য কত নিলে জানি?" মুরলীমোহন অতি অনিচ্ছায় মূল্য বলিতেই পূজনীয় দাদুভাই বলিলেন, "ওরে বাবা! এত দামী জিনিষ আমি খেতে পারবো না।" একথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম।

ইহারপর পূজনীয়া ঠাকুর মাতার ইচ্ছায় সকলের আর একবার চায়ের ব্যবস্থা হইল। আর অধিকক্ষণ বাহিরে না থাকিয়া সকলেই আমরা ভিতরে আসিলাম। প্রতিদিনের ন্যায় পর পর নিয়মিত সকল কার্য্য, বিশ্রাম আলাপ এবং ভোগ ও প্রসাদ গ্রহণ ইত্যাদি সমাপন হইল।

শয়নের প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর জলপান করিতে করিতে বলিলেন, "বিভূতি, তোকে একটি কাজ করতে হবে, বাবা। তোর কষ্ট হবে না তো?" বিভূতিভূষণ বলিলেন, "কষ্ট! বলুন কি কাজ?" ঠাকুর বলিলেন "কাল ভোরে সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে প্রায় ছ'টায় এখান থেকে যে ট্রেণ ছাড়ে সেই ট্রেণ ধরে গিরিডি যাবে। গিরিডিতে বাবুলাল ড্রাইভারকে বলে ফিরবে যে আমরা অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টির জন্য এখানে আটকে পড়েছি। অবশ্যি এটিই একমাত্র কারণ নয়, তবু এই ঝড়-বাদলে কিছুতেই যাওয়া হত না। একথা পূর্ব্বেই

জানতে পেরে এঁদের মতে মত দিয়ে আর দুদিন এখানে থাকবো ঠিক করেছিলাম। যা হোক, তুমি তাকে বৃষ্টির কথা বলবে, আর বলে দেবে বুধবার বিকেল সাড়ে চারটের সময় গিড়িডি ষ্টেশনে গাড়ী নিয়ে উপস্থিত থাকতে। সেই সময় আমরা গিড়িডি পৌঁছাব।”

বিভূতিভূষণ বলিলেন, “কাল ভোরেই আমি যাচ্ছি। আপনি এখন শুয়ে পড়ুন বাবা। তখন রাত্রি এগারটা। শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলেন। মুরলীমোহন মশারীটী ফেলিয়া সযত্নে শয্যার চারিপাশে গুঁজিয়া দিলেন।

আমরা যথাস্থানে চলিয়া গেলাম ও নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম। শুইয়াই ভাবিলাম—

“শয়নে প্রণাম জ্ঞান,
নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ও মন, নগর ফির, মনে কর,—
প্রদক্ষিণ শ্যামা মাকে।”

—মাতৃরূপী শ্রীগুরু মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া বিস্মৃতির গভীরে মগ্ন হইলাম।

আজ মঙ্গলবার, ১৩ই জুন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সাড়ে চার ঘটিকায় ঠাকুরমার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। সে সময় তিনি বিভূতিভূষণকে ডাকিয়া দিলেন। আমিও তখন জাগিয়াছি। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিভূষণ উঠিয়া পড়িলেন এবং নীচে মুখ হাত ধুইয়া স্নান সারিয়া ঠাকুরমার নিজহস্তে প্রস্তুত চা ও কিছু মিষ্টি খাইয়া উপরে

আসিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ইতিমধ্যে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। তাঁহাকে ও গুরুজনদিগকে প্রণামান্তর বিভূতিভূষণ সত্বর ষ্টেশনাভিমুখে বাহির হইলেন।

এদিকে আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ চলিতে লাগিল। প্রসাদ ভোগান্তে আমরা ঠাকুরের কাছে বসিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রম্ভ আলাপের পর শ্রীগুরুর আদেশে আমরা সকলে মিলিয়া পিতৃদেব-রচিত পাপতাপ-হর স্তোত্র গাহিতে লাগিলাম—

"হর পাপ হর, হর তাপ হর।
(হর) হর হর হর, মম শোক হর॥
হর ক্রোধ হর, হর লোভ হর।
(হর) হর হর হর, অজ্ঞান হর॥
হর মিথ্যা হর, হর ভীতি হর।
হর কৃপণতা, কুটিলতা দৈন্য হর॥
হর দম্ভ হর, হর হিংসা হর।
(হর) হর হর হর, সব দোষ হর॥
হর ব্যাধি হর, হর অশুভ হর।
হর শঙ্কর, সঙ্কট মুক্ত কর॥
হর মহেশ্বর হর জগৎ গুরু।
হর প্রসীদ প্রসীদ, করুণা কুরু।
জয় জয় জয়, হর বিজয় কর
হর নমস্কার শিব। নমস্কার॥"

ইহার পর মহাত্মা রামপ্রসাদের একটি কীর্ত্তন আমরা করিলাম—

"দাও গুরু আমায় শিষ্যব্রত।
(করি) সারাজীবন ব্রত পালন
হয়ে তোমার পদানত॥
খুলিয়া হৃদয় দ্বার পাঠ করি বারে বার
(ওগো) অভিপ্রায় কি তোমার বল আভাসে ইঙ্গিতে যত॥
(ওগো) কখন তুমি কোন বেশে, কি বলে যাবে এসে,
আমি শুনব বসে ব্যাকুল হ'য়ে
তোমার বাণী অবিরত॥
যে চরিত্রে ভাল যাহা, ভালবেসে লব তাহা।
ভালরে বাসিয়া ভাল (আমি) হব ভালয় পরিণত॥
যে অবস্থায় যে শিক্ষা,
যে মন্ত্রেতে যে দীক্ষা
তুমি দিয়ে যাবে ভালবেসে
আমি ল'ব শিরে অবনত।
আমায় যেমন রাখ তেমনি রব
যা সহাবে তাই সব
হ'বে তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা
আমি হ'ব মনের মত॥"

দাদুভাই ইতিমধ্যে কখন আসিয়া বসিয়াছেন। চোখ দুটি তাঁহার জলে ভরা।

... ...

বেলা চারিটার সময় বিভূতিভূষণ শ্রীচরণে উপস্থিত হইলেন, এবং বাবুলালের কথা বিস্তারিত নিবেদন করিলেন। সেই কথা লিখিতেছি। বাবুলাল বিভূতিভূষণকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল ও বলিতে লাগিল, "বাবা বোল গ্যায়ে যে সোমবার সাড়ে নয় বাজে জরুর লোটেঙ্গে, লেকিন বাবা তো নেহি আয়ে। হাম বহুত শোচমে পড় গ্যায় থে। কেয়া জানে কেযা হুয়া। আজ তক ইতনা দিন সাধু বাবাকো হাজাবিবাগমে দেখ্ বহাহু ঁ। এ্যায়সা কভি নেই হুয়া। যব য্যায়সা বলতে হ্যায় উস্‌কা কভি ঝুটা নেহি হোতা হ্যায়। হাম এ্যায়সা ভি শোচ বহা থা, ৺বৈদ্যনাথ চলা যায়ে খবব করে, নেহিতো হাজারিবাগমে খবর লেলে। কেয়া হালত হুয়া ইয়েভি কোশিস কিয়া থা, টেলিফোনমে কুছ খবব আগর মিল যায়। কেয়া করু ঁ, এ্যায়সা হুয়া কুছ্ বন্দ্ বস্ত মায়নে নেহি কর শকে ঁা।" এইরূপ কত কথা সে বলিল। বিভূতিভূষণ তাহার সকল কথা শুনিয়া যে কারণে আমাদের যাওয়া হয় নাই তাহা তাহাকে বলিয়া দিলেন, এবং ঠাকুরের আদেশ মত আমাদের গিড়িডি আসিবার দিন ও সময় উহাকে বলিয়া দিলেন। সমস্ত শুনিয়া বাবুলালের শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখিয়া আমাদের আনন্দে বুকখানা ভরিয়া গেল। বড়ই তৃপ্ত হইলাম একটি ট্যাক্সিওয়ালার এই সাধুপ্রীতি দেখিয়া। "জয় গুরু," "জয় গুরু"!

৺বৈদ্যনাথ মন্দিরে

এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "তোমরা সকলে প্রস্তুত হয়ে নাও। আজ সন্ধ্যায় ৺বাবার মন্দিরে যাব।" সকলেই নিজ নিজ কার্য্য সারিতে লাগিয়া গেলেন। আমিও স্নান করিতে গেলাম। মুরলীমোহন শ্রীশ্রীঠাকুরের বৈকালিক স্নানাদির সকল ব্যবস্থা করিলেন। গতকল্যের ন্যায় ঠাকুরমা সন্ধ্যা পূজারতির আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিলেন। আজ আর শ্রীশ্রীঠাকুরের সহোদরা আমাদের সহিত মন্দিরে গেলেন না। রাধাগোবিন্দও বাড়িতে রহিল। আমাদের ফিরিতে বিলম্ব হইবে, সেই জন্য রাধাগোবিন্দকে ভোগ রান্নার পূর্ব্ব-প্রস্তুতি করিয়া দেওয়া হইল। আর সকলেই মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ঠিক পাঁচটার সময় গাড়ীখানিও আসিল, এমন সময় আসানসোল হইতে আমাদের দুই গুরুভ্রাতা, একজন ডাঃ ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য এবং অপরটি শ্রীনারায়ণচন্দ্র সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়কে দেখিয়া আমরা সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। প্রশ্ন করিলাম, "কি করে সংবাদ পেলেন আমরা এখানে আছি, আর, যদি-বা সংবাদ পেলেন, এখন পর্য্যন্ত যে আমরা এখানে আছি এ কি করে জানতে পেলেন? শ্রীশ্রীঠাকুরও এই প্রশ্ন করিলেন। ইন্দুভূষণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আশ্রম থেকে অনন্তর কাছে একখানি পত্র দিয়াছিল, তাইতে

জানতে পেলাম সব।" অনন্ত আমাদেরই এক গুরুভগ্নীর বালক-পুত্র। সে উপস্থিত আসানসোলে ইন্দুভূষণেব নিকট থাকে। কি আশ্চর্য্য! যাঁহার যখন শ্রীগুরুদর্শন লাভেব সুযোগ হয়, তখন এই ভাবেই যোগাযোগ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর ইহাদেব আসিতে দেখিয়া টাাক্সিখানিকে তখনকার মত ফেরত দিলেন ও বলিয়া দিলেন ছ'টাব সময় পুনরায় আসিতে। ট্যাক্সি চলিয়া গেল। আমরা নিশ্চিন্ত মনে ঠাকুবেব সাথে আমাদের এই নবাগত ভ্রাতা ছু'টির আলোচনা শুনিবার জন্য সেই স্থানে উপবেশন করিলাম, কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। কারণ কাষ্টার টাউন হইতে তিনটি গুরু-ভগ্নী শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমন সংবাদ পাইয়া দর্শন লাভেচ্ছায় তখন উপস্থিত হইলেন। কাজেই তাঁহাদের সহিত আলোচনায় শ্রীশ্রীঠাকুর ট্যাক্সিখানা পুনরায় আসা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিলেন। বিভূতিভূষণ সেই সুযোগে মুবলীমোহনের সঙ্গে পূজনীয় দাদুভাইর সহিত কিছু মধুর আলাপ ও তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে যেস্থানে শ্রীশ্রীদাদুভাই একখানি আরাম কেদারায় অঙ্গ এলাইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন সেই স্থানে গিয়া বসিলেন।

ট্যাক্সি আসিতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের আহ্বানে পূজনীয়া ঠাকুরমা, মঞ্জুমা ও মীরা, মুরলীমোহন ও আমি একে একে গাড়িতে উঠিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরও উঠিয়া বসিলেন। সশব্দে গাড়ীখানি উঁচু নীচু রাস্তা পার হইয়া শ্রীকান্ত রোড ছাড়াইয়া ৺বাবার মন্দিরের দিকে রওনা হইল। আমরা নির্ব্বিঘ্নে মন্দিরের গলির সামনে আসিয়া পৌঁছাই-লাম। গাড়ীখানি থামিতেই একে একে সকলে নামিয়া

শ্রীশ্রীঠাকুরের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম। মন্দিরের সিংহ-দরজায় আসিয়া পৌঁছাইতে আবার দেখিলাম,—শ্রীশ্রীঠাকুর সমস্ত মন্দিরটি দর্শন ও প্রণাম-প্রদক্ষিণ করিয়া মন্দির-চূড়ায় মুহূর্ত্ত-দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। মস্তক স্পর্শ করিয়া আর একটি প্রণাম অর্পণ করিলেন, মস্তক স্পর্শ করিয়া আমরাও সকলে প্রণাম করিলাম! প্রণামান্তে নিমেষে আবার "এ কি হেরিলাম নয়ন মেলে।"

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক দেবালয়ে সন্ধ্যা-দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ৺বৈদ্যনাথ মন্দিরের সম্মুখে শতভক্তের পদধূলি সর্ব্ব অঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর আপন বুকখানি পাতিয়া লেপন করিলেন, ভক্তপদ-রজঃ ললাটোপরি জয়তিলকরূপে ধারণ করিলেন, শ্রীঅঙ্গখানি ভূতলে লুটাইয়া পড়িল,—সমস্ত দেহ মন ঢালিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া একী প্রণাম!—নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়া বিশ্বদেবের এ-কী বন্দনা!...সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল আমার, সেই অমর গীতি—

"মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্তপদধূলি,
কাঁধে লয়ে চির বৈরাগ্যের ঝুলি
পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি'
অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার।...

এখনও প্রধান পাণ্ডার পূজা শেষ হয় নাই॥ তাই মন্দির-দ্বার এখনও রুদ্ধ রহিয়াছে। পূর্ব্বদিনের ন্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর ধাপিটীর উপর ক্ষণপরে বসিয়া পড়িলেন। আমরাও সকলে সে-স্থানে বসিলাম। দেখিলাম, মন্দিরের ভারি কপাটটি রুদ্ধ রহিয়াছে

বলিয়া কোন অজানা ভক্ত ৺দেবতার উদ্দেশ্যে পাঁচটি দেউটি জ্বালিয়া দিয়াছেন।—তাহার মধ্যে দুটি উজ্জ্বলালোক উদ্গীরণ করিয়া ঝল্‌মল্ করিয়া জ্বলিতেছে। একটির নিবু-নিবু অবস্থা, স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। আর একটি নিভিয়া গিয়াছে। শেষটির সলিতা ভূমি স্পর্শ করিয়া যেন ৺বিগ্রহকে প্রণাম করিতেছে এবং শেষ শিখাটুকু দৃশ্যতঃ নিভিবে বলিয়াই আহুতির জন্য যেন অবনত হইয়া রহিয়াছে। স্থিরনেত্রে সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবিতেছি—

"—এই শিখাটাই
ধ্রুব জ্যোতির তারার সাথে,
মৃত্যুহীনের দখিন হাতে,
জ্বলবে বিপুল বিশ্বতলে।"

হঠাৎ ভাব ঘুচিয়া গেল—রেশটুকু রাখিয়া অবশ্য। একটি বাচ্চা ছড়িদার সহসা শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। আমরা সকলেই তাহাকে দেখিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম কারণ, তাহার ভাব-ভঙ্গী ও চাহনি দেখিয়া মনে হইল—এটি একটি অর্দ্ধোন্মাদ। শ্রীশ্রীঠাকুরকে এক ধাক্কা দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দিরে যাবেন সাধুবাবা, হামি নিয়ে যাবো। এখনি দরওয়াজা খুলবে। মন্দির খুললে দর্শন করিয়ে দেবো, জী।" সে কতই উদ্ব্যস্ত করিতে লাগিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি নির্ব্বিকার—ধীর, স্থির, 'আত্মভোলা। আমাদেরও এমন কোন উপায় নাই যে তাহাকে কিছু বলি, কারণ

পাছে ঠাকুর অসন্তুষ্ট হন। হঠাৎ ঐ ছেলেটির কি খেয়াল হইল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল, ও একটু দূরে সরিয়া গেল। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলাম।

আবাব দেখি ঐ ছড়িদার আসিয়া বলিতেছে, "মন্দির খুলেছে,—চলুন।" শ্রীশ্রীঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও আমরা তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে সশব্দে ভারী পট দুটি খুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে মন্দির কম্পিত করিয়া তিনবার "ওঁ হর হর ব্যোম্ ব্যোম্" ধ্বনি উচ্চারিত করিলেন। আমরাও কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সে হুঙ্কার ধ্বনিতে যোগ দিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর আমাদের সকলকে বলিলেন, "তোমরা এস্থানে দাঁড়াও, একেবারে ভিতরে প্রবেশ করো না।"

সন্ধ্যায় সদ্য-ধৌত, তখনও শুষ্ক হয় নাই,—পাথরের দালানটির সেইখানেই শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেকে লুটাইয়া দিলেন, এবং সর্ব্বাঙ্গে জল-কাদা মাখিয়া দাঁড়াইলেন!—ঐ যে বাচ্চা ছড়িদারটি, আজ আর সে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কিছুতেই ভাব-বিভোর হইতে দিবে না—যেন ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন শ্রীঅঙ্গ লুটাইয়া প্রণাম করিতেছিলেন, এই ছড়িদার তাঁহার শিরোপরি হস্তের মৃদু আঘাত করিয়া যেন আশীর্ব্বাদ করিতেছে—এইভাবে দুই তিন বার আঘাত করিল। সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কে এই ছেলেটি,—এত স্পর্দ্ধা, একটু ভয় নাই, শ্রদ্ধা নাই! গুরুভাইরা ইহাকে সরাইতেও পারিতেছেন না—ঠাকুরের ভয়ে। ব্যাপার

লক্ষ্য করিতেছি, আর ভাবিতেছি—উপায় নাই। বহু বারই মন্দিরে আসিয়াছি, বহু তীর্থস্থান ঘুরিয়াছি—এমনটা আর দেখি নাই। পনের কি ষোল বৎসর হইবে, একটি বালক ছড়িদারের হাতে এইভাবে উদ্ব্যস্ত হইতে কাহাকেও কখনও দেখি নাই কোথাও। আমরা যে এতক্ষণ মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করি নাই তাহাতেও গর্ভমন্দির জনশূন্য। এইবার শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি লইয়া পূজনীয়া ঠাকুরমাতা সহ আমরা সকলে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিলাম, এবং শুধু একটিবার প্রণাম করিতে পারি বা না পারি মস্তক স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আমরা বাহিরে আসিলে শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমি এমন স্থানে দাঁড়াইলাম যেন কতকটা দেখা যায়। বিভূতিভূষণও তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পিনাক-পার্শ্বে আলু-থালু ভাবে বসিয়া পড়িলেন। উত্তরীয়খানি ইতিপূর্ব্বেই কটিতটে বাঁধিয়াছিলেন। ঐভাবে বসিয়াই শ্রীঅঙ্গ অল্প হেলাইয়া ধীরে ধীরে হস্ত দুটি পিনাকোপরি স্থাপন করিলেন। তারপর মুখখানি ঈষৎ নামাইয়া অস্ফুট ভাষায় কি যেন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, সে সময় নয়ন দুটি অর্দ্ধ নিমীলিত—শিবনেত্র ভাব। বিভূতিভূষণ অতি কাছে থাকিয়া স্থির নেত্রে এই অপরূপ মোহন-মূর্ত্তি দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইলেন। এইবার মস্তক স্পর্শ করিয়া সেই স্থানে পিনাকের উপর লুটাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও হস্ত দুটি বক্ষোপরি রাখিয়া জোড়হস্তে

৺বৈদ্যনাথ জিউর দিকে মুখ করিয়াই ধীর পদক্ষেপে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। বাহিরে আসিয়া মন্দিরের দালানটিতে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর "ওঁ নমঃ শিবায়"--এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। করিবা-মাত্র আমরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে "ওঁ নমঃ শিবায়" উচ্চারিত করিয়া ঐ স্থানটি ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিলাম। কিছুক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে আমরাও স্তব্ধ হইলাম। কিন্তু তখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের উচ্চারিত "ওঁ নমঃ শিবায়" --এই গুরুগম্ভীর শব্দটির রেশ রহিয়া রহিয়া যেন মন্দিরের ভিতর হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের প্রাঙ্গণ ও আকাশ-বাতাস পর্য্যন্ত মুখরিত করিতে লাগিল, এবং থাকিয়া থাকিয়া যেন প্রাণের ভিতর এক অনুপম স্পন্দন হইতে থাকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কি জানি কি উদ্দেশ্যে মুরলীমোহনকে ডাকিয়া ৺বাবার মাথায় ষোল আনা চড়াইয়া আসিতে বলিলেন। মুরলী-মোহন দক্ষিণা লইয়া ভিতরে একটু অগ্রসর হইতেই, কি কাণ্ড !—সেই বাচ্চা ছড়িদারটি মুরলীমোহনের কাছে সেই ষোল আনা দাবি করিল। তিনি উহা দিতে অস্বীকৃত হইলে সজোরে উহা হাত হইতে কাড়িয়া লইল। মুরারীমোহন নিরুপায় হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর আগাইয়া গিয়া দেবতার প্রাপ্য ঐ দক্ষিণা ছড়িদারের নিকট হইতে ৺বাবার আদেশে আদায় করিয়া লইলেন ও তাহাকে বলিলেন, "তোমাকে খুশী করিব, কিন্তু তুমি ঐটি কেড়ে নিলে কেন? ঐ ষোল আনা ৺বাবার মাথাতেই চড়ানো হবে।" এইবার মুরলীমোহন সেই ষোল আনা লইয়া

৺বাবার মাথায় চড়াইয়া আসিলেন। পরে ঠাকুর ছেলেটিকে খুশী করিয়া বিদায় দিলেন।

জানি না কোন উদ্দেশ্যে আজ এই ষোল আনা বালক-হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইতে হইল। উন্মত্তবৎ বালকটি ইহা সহজে দিতে চাহে নাই এবং ইহা আদায় করিতে ঠাকুরকে কিছু বেগও পাইতে হইয়াছে।

আমার মনে হইতে লাগিল,—"এই বালকটি কে? কেনই বা সে এরূপ অদ্ভুত ব্যবহার এতক্ষণ করলে? কেনই-বা শ্রীশ্রীঠাকুর এ'কে সরিয়ে দেন নি? কি জানি,—শ্রীগুরু কি ব্রহ্মচারী মুরলী-মোহনের কোনরূপ আশু বিপদ কাটাইবার জন্য স্থূলে এই অর্দ্ধোন্মাদ বালকটিকে সম্মুখে স্থাপনা করিলেন?

সংযমের নগ্নরূপেরও কি এটি এক দৃষ্টান্ত? সংযমের ষোল আনা কঠিন মুষ্টির মধ্যে ধরে যদি রেখেছে কেউ, সংসার নিষ্ঠুর নির্ম্মম ভাবে তা ছিনিয়ে নেয় কালে। কিন্তু কৃপাময় শ্রীগুরু এক রুদ্র-রূপে তা কেড়ে নেন. আর এক দাক্ষিণ্য-রূপে তা শ্রীগুরুতে অর্পণ করিয়ে তা ফিরিয়ে দেন,—জ্ঞান-চক্ষু প্রদান ক'রে জ্ঞানময় তাঁতে তা লয় করিয়ে নেন। না, একথায় আর প্রশ্ন নেই!—রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"...

এইবার বাড়ী ফেরার পালা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব-মাধুর্য্য ও বিচিত্রলীলায় আমরা এতক্ষণ তন্ময় হইয়াছিলাম। মন্দির হইতে আমরা সকলে বাহিরে আসিলাম। পূজনীয় দাদুভায়ের প্রিয় দেবতা ৺শালগ্রাম জিউর

জন্য যৎ সামান্য এলাচ-দানা ক্রয় করিয়া সকলে মিলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

আমরা যথা সময়ে গৃহে পৌঁছাইলাম। ইন্দুভূষণ ও নারায়ণ এবং বাটীস্থ অন্যান্য সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরেব ফিরিয়া আসার অপেক্ষায় এতক্ষণ পর্য্যন্ত পথ পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমাদের গাড়ীখানি থামিতেই সকলে গাড়ীব নিকট আসিলেন ও সানন্দে সকলে মিলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুব আসিয়াই মুখ, হাত-পা ধুইয়া বাহিরের দালানে ভূমিতে একটি সতরঞ্চির উপব তাকিয়া লইয়া বিশ্রাম করিতে বসিলে ইন্দুভূষণ, নারায়ণ কাকুজী, ঠাকুর-মা, আমি ও স্নেহময়ী-মা এবং আরও দুই তিনজন সেইস্থানে উপবিষ্ট হইলাম। ইঁহাদের মধ্যে ইন্দুভূষণ শ্রীপদ-সেবায় রত হইলেন ও কাকুজী মাথায় পাখার বাতাস দিবার প্রেরণায় শ্রীগুরু-শিয়রে বসিলেন। একটি হ্যারিকেন অল্পদূরে একখানি জলপূর্ণ থালায় রাখা হইল, কারণ বাদলা পোকা বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিতেছিল। এই পর্য্যন্ত দেখিয়া বিভূতিভূষণ, মুরলীমোহন ও মঞ্জু-মা পূজনীয় দাদুভায়ের নিকট আসিয়া বসিলেন।

আমাদের নিয়ম,—শ্রীশ্রীঠাকুর যখনই কোন সদালোচনা করিবেন বা শিক্ষা দিবেন, সে সময় আমাদের তাঁহার কাছে থাকিতেই হইবে, আর সেই সকল আলোচনা ও শিক্ষা একাগ্রচিত্তে শুনিতে হইবে, শিখিতে হইবে, অভ্যাস করিতে হইবে এবং সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। ইহাই শ্রীগুরুদেবের শিক্ষা। আলোচনায় শুধু উপস্থিত থাকিলেই চলিবে না, উহা শ্রবণ, মনন, ও সতত

নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। আরও এক কথা, সন্তানেরা আশ্রমে যতক্ষণ, -আশ্রম কাজের দায়-দায়িত্ব না পড়িলে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছছাড়া কেহই প্রায় কখনও হন না।

আগামী কল্য আমরা চলিয়া যাইব। আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজনীয় পিতৃদেবের নিকট বসিয়া তাঁহার কাছে কিছু শুনিয়া ও তাঁহার তৃপ্তিদায়ক দুটি-কিছু বলিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিতে, তাঁহাকে সেবা করিতে বিভূতিভূষণ, মুরলীমোহন ও মঞ্জু-মা'র আজ একান্ত সাধ জাগিয়াছে।

যাহা হউক এদিকে আলোচনা চলিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "নারায়ণ, বল দিকিন, রাস্তা কাকে বলে? তোরা যে বলিস্—ভগবানকে পেতে গেলে এই ধ্যান করতে হবে, যোগযাগ করতে হবে ইত্যাদি রাস্তার কথা বলিস—ঠিক রাস্তা কা'কে বলে, বল দিকিন?"

নিজেই উত্তর দিয়া চলিলেন ঠাকুর,—"দেখ রাস্তা দিয়ে আমরা করি কি?—না চলি। তা হলে রাস্তা বলতে আমরা বুঝি কি? না, রাস্তা হল গতির প্রতীক।...

"এখন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত আমরা নানা রকমের কাজ করি,—মনের গতি আমাদের বিভিন্নমুখীন হতে থাকে,—মন বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে চলতে থাকে। তখনও কিন্তু ঠিক ঠিক রাস্তা পাইনি। ঠিক ঠিক রাস্তা পেয়েছি—তখনই বলব যখন মনের গতি এক-মুখীন হয়ে যায়। তখন বুঝতে হবে যে আমরা রাস্তা পেলাম।...

"মনের গতি এক-মুখীন হয়ে গেলে—ওরে, তখন তাকে কেউ রুখতে পারে ?...

"তাই না বলি বাবা,—এক লক্ষ্য হতে হবে, এক লক্ষ্য করতে হবে। প্রাণপণে—একপণ !"

একজন অধ্যাপক বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, রাস্তায় যেমন 'মাইল ষ্টোন (দূরত্ব জ্ঞাপক প্রস্তর-স্তম্ভ) আছে, তাই দেখে আমরা বুঝতে পারি আমরা কতটা এগুচ্ছি, কি কতখানি পিছিয়ে পড়ছি, তেমনি কি দেখে বুঝবো যে আমরা এগুচ্ছি কি পিছোচ্ছি ?"

"খুব ভাল প্রশ্ন !"—বলিয়া ভূমিতে চাপড় দিয়া উৎসাহ দিয়া উঠিলেন ঠাকুর। বলিলেন, "দেখ, ঠিক ঠিক এগুচ্ছিস তখনই বুঝবি বাবা,—যখন কোন তাতেই আর সঙ্কল্প ভ্রষ্ট হচ্ছিস না—মনের এক ছাড়া আর দুই গতি নেই।

"বেশ তো, রাস্তায় কারও সাথে দেখা হল,—খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করে আবার এগিয়ে যাও। তাই বলে গা-ভাসিয়ে দিবি কেন, টলে যাবি কেন ?..."

বলিয়া চলেন ঠাকুর, "দেখ, অনেকের ধারণা এই—যোগাভ্যাস করতে পারলে বেশ কিছুটা শক্তি, হয়ত অলৌকিক শক্তি লাভ হয়। "অথচ শক্তি মানে ওরা বোঝে না। শক্তি মানে কি বলতো ?—শক্তি কা'কে বলে ?"

উত্তর দিয়া চলিলেন ঠাকুর, "শক্তি মানে এখানে শারীরিক, বা মানসিক শক্তি নয়। শক্তি মানে হচ্ছে প্রকাশ। তুমি, আমি,

সবাই—সেই শক্তি। প্রসঙ্গত বলে নিই, ব্যক্তি মানেও তাই। ব্যক্ত করে বলেই—ব্যক্তি। ভাবের অভিব্যক্তি,—মানে শক্তি, মানে প্রকাশ।"

একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা, বাবা, সবাই যদি শক্তিমান, তা হলে আমরা মহাপুরুষদের কাছেই বা যাই কেন?

উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "এই যে আলোটা জ্বলছে—এটাও শক্তি, আবার তোমরা যে বসে আছ—তোমরাও শক্তি। এখন এই আলোটা জ্বলছে বলে তোমরা নিজেদের দেখতে পাচ্ছ। আলোটা নিভিয়ে দাও, দেখবে—যদিও তোমরা শক্তি, তোমরা নিজেদেরকেই আর দেখতে পাচ্ছ না। এখন আলোটা ধর দূরে জ্বলছে—অল্প-স্বল্প আলো দেখা যায়। এই আলো দেখে তোমরা সবাই ছুটলে, নিজেদের ভাল করে দেখবার জন্যেই ছুটলে।...

"মহাপুরুষেরাও তেমনি আলোর মত জ্বলছেন।—তাঁদেরকে দেখে দূর থেকে অগণিত ভক্ত, শিষ্যগণ ছুটে ছুটে যান—নিজেদের দেখবার জন্যেই ছুটে যান।

এবারে ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, "ভাব কাকে বলে?"

উত্তর দিচ্ছেন নিজেই, "মনের গতিশীল অবস্থাটাই হচ্ছে ভাব! বিভিন্ন অবস্থা—বিভিন্ন ভাব।"

আবার প্রশ্ন করিলেন, "অনুভূতি কাকে বলে, বল দিকিনি?"

নিজেই আবার উত্তর দিলেন, "প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করাই হচ্ছে অনুভূতি।

"যেমন, ভগবান সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রত্যক্ষানুভূতি নেই। তাই অসুখ হলে আমরা ভগবানকে ডাকি না,—ডাকি ডাক্তারকে।"

তত্ত্বদর্শী পুরুষদের সম্বন্ধে বলিয়া চলিলেন ঠাকুর, "দেখ্, তত্ত্বদর্শী পুরুষেরা কি ভাবে দেখেন, জানিস্?—তাঁরা দেখেন, একটাই চৈতন্য বিভিন্ন মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার-যুক্ত হয়ে বিভিন্ন খেলা করছেন।

যেমন কাঁসারিরা।

"এটা কি?—না, পানের ডিবে।

এগুলা ধরো—ঘটি, বাটি, ঘড়া ইত্যাদি।

"এখন কাঁসারী বা সেকরার চোখে, এটা ডিবে নয়, ঘটিও নয়, বাটিও নয় ঘড়া নয়। তারা দেখে একই কাঁসা বা পিতল থেকে এই ডিবে, ঘটি, বাটি, ঘড়া ইত্যাদি তৈরী হয়েছে। মূলে—একই—কাঁসা বা পিতল।

দর্শী পুরুষদের বেলাতেও ঠিক তেমনি। সবই মনে। এই ধরো, 'রজ্জুতে সর্প-ভ্রম'—কথাটার মানে কি?

"না, তোমার আমার মধ্যে যে সর্প বিষয়ক জ্ঞান আছে, সেইটে, তুমি-আমি, রজ্জুতে আরোপ করছি। ফলে রজ্জুকেই সর্প মনে করছি।

"এই যে আমাকে তোমরা দেখছ,—ধরো গুরুকেই তোমরা দেখছ, বলো গুরু বলতে কি বোঝ?

"তোমরা কি আমার এই দেহটাকেই দেখছ,—না, এই সাড়ে তিন হাত প্রমাণ মানুষটিকেই দেখছ?—তাতো ঠিক নয়।

তোমাদের মধ্যে যে গুরুত্ব বুদ্ধি আছে—সেইটেই আমার উপর আরোপ করছো। বুঝলে?"

পরিশেষে প্রশ্ন করিলেন ঠাকুর, "সেবা কাকে বলে বল দিকিনি?"

উত্তরও দিলেন,—"না, সেব্যের ইচ্ছাই সেবা। কিন্তু তোমরা কর ঠিক তার উল্টোটা। তোমরা কর কি? না, তোমাদের নিজেদের যেটা ভাল লাগে সেইটাই কর। তাতো ঠিক নয়। গুরুর যা ভাল লাগে, গুরুর যা ইচ্ছা সেই অনুসারে সেবা করাটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক সেবা।

"সেই পুরাকালে মুনি-ঋষিদের আশ্রমে কি হত?—না, যেসব সন্তানেরা ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভেচ্ছু হয়ে ঋষির আশ্রমে আসতেন, আশ্রমাচার্য্যেরা তাঁদের গরু চরাতে দিতেন, কাঠ কুড়োতে দিতেন, ঘর দোর আঙিনা ঝাঁট দিতে দিতেন, ভৃত্যের কাজ, পরিচর্য্যার যাবতীয় কাজ করতে দিতেন, বা এমন সব কাজ করতে দিতেন, যা তাদের অহমিকা অভিমানকে আঘাত দিতে পারতো। আজ কালকার দিনে ঐ সব কাজকর্ম্ম করতে বললে সন্তানেরা হয়ত পাঠ তুলে কেটে পড়বেন।

"কিন্তু তখনকার দিনে এর ফল হত কি জানিস? যে সমস্ত সন্তানেরা ঐ সমস্ত সেবাব্রত গ্রহণ করতেন,—তাঁদের মধ্যে এই কর্ত্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ আমি কর্ত্তা এই অভিমান—এই অহং-এর অনেক পরিমাণে নাশ হয়ে যেত। অহং নাশ না হলে তো কিছু হবে না, বাবা। তাঁদের সমস্ত কাজ কর্ম্মের মধ্যে এই দৃষ্টিই

সদা জাগ্রত থাকত যে কর্ত্তা আমি নই। আমার কর্ত্তা হচ্ছেন লোকাধীশ গুরু—তাঁরই নির্দ্দেশে আমি পরিচালিত হচ্ছি। যা কিছু করছি, তাঁরই কর্ম্ম করছি। তাঁরই প্রীত্যর্থে করছি। এই বোধটা যত গাঢ় হতো, ততই তাঁদের অহং নাশ হয়ে যেত, এবং পরে গুরুর কৃপায় তাঁদের এই অহং-এর সম্পূর্ণ নাশ হলে, তাঁরা এই সেবাব্রতের মধ্য দিয়েই সেই পরাজ্ঞানের অধিকারী হতেন।

তাই বলি, বৎসগণ, ঠিক ঠিক সেবাটাও যদি তোরা করতে পারিস, তা হলেও এতদিনে অনেক দূর তক তোরা এগিয়ে যেতে পারতিস।...

সভা শেষ হইল।

সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদধূলি লইয়া বিদায় লইলেন।

... ...

ওদিকে দাদুভাইর কাছে বসিয়া আছেন বিভূতিভূষণ, মুরলীমোহন ও মঞ্জু-মা। আমি উঁহাদের কাছে সবিস্তারে এখন শুনিলাম, দাদুভায়ের অমৃত উপদেশাবলী। বিষয়-বস্তু আশ্চর্য্যরূপে একই প্রায় হইয়াছে।

শুনিলাম, দাদুভাই, বিভূতিভূষণ, মুরলীমোহন ও মঞ্জু-মার সহিত দু'একটি কথা কহিয়া বলিলেন,—"কাল তোমরা গোকুল অন্ধকার করে মধুপুর চলে যাবে।" প্রিয় পুত্রের আসন্ন বিরহ-ব্যথায় স্নেহময় বৃদ্ধপিতার মধুর এই উক্তি। ইহার পর কত ভাবে গুরুভক্তি গুরুপ্রেম কিভাবে করিতে হয় তাহাই উঁহাদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"উপযুক্ত শিষ্য হতে চেষ্টা

করো। উপযুক্ত হওয়া বড কঠিন ভাই, এ জগতে উপযুক্ত শিষ্য মেলা ভাব।—'গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক।' —সব হাম বড়া! তোমরা তো ভাগ্যবান,—সদ্‌গুরু সত্যিই পেয়েছ তোমরা। কারণ,—সে তার গুরুর সত্যিকারের শিষ্য হতে পেরেছিল, তাই তার শিক্ষা-দীক্ষা অতুলনীয়। এ ত্বর গুরুগিরি নয়। ...দেখনা, কতবার আসা যাওয়া হয়ে গেল, এখনও পর্য্যন্ত—এই এতখানি বয়স হল, যাবার বেলা হুড় করে এগিয়ে এল, তবু উপযুক্ত শিষ্যই হতে পারলাম না। একবার আমার ঠাকুর—মহর্ষি সত্যদেব, এক শিষ্যকে সন্দিগ্ধ চিত্ত দেখে বলেছিলেন, 'ওরে, তোকে ঢোঁড়া সাপে কামড়ায়নি, কেউটে সাপেই কামড়েছে।' গুরু—ভগবান, নারায়ণ স্বয়ং। সেই গুরুতে সন্দেহ হয়েছিল বলেই না তিনি একথা তাকে বলেছিলেন। সকল সন্দেহ-সংশয়ের পূর্ণ নিরসন—সে কি সহজ! 'গুরু কৃপাহি কেবলম্'। 'নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' গুরুতে লঘুত্ব বুদ্ধি সর্ব্বনাশা। শুভ-বুদ্ধির নাশ মানেই সর্ব্বনাশ। শুভবুদ্ধি মানেই গুরুত্ব জ্ঞান, চিন্ময় ধ্যান। সুতরাং 'প্রাপ্য বরান নিবোধত'। কি বল তোমরা?"

এবংবিধ আরও সদুপদেশ দিবার পর শেষটায় বলিলেন, "তোমরা প্রার্থনা করো—আমি যেন তোমাদের ঠাকুরের উপযুক্ত পিতা হতে পারি।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতা বটে! কতখানি বিশ্বাস পুত্রের প্রতি, কত বড় বিনীত চিত্ত—পুত্রের পিতা হইয়া পুত্রের গৌরবে

গৌরবান্বিত হইয়া তিনি পুত্রের উপযুক্ত পিতা হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, আমাদিগকে সেই প্রার্থনা করিতে বলিতেছেন।

আমার আঁখি অশ্রুপূর্ণ হইল। ভাবিলাম—এই শেষ কথাটিই তাঁহাকে তাঁহার পুত্রের উপযুক্ত পিতাই করিয়াছে।

... ...

রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকা হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে লইয়া ও দাদুভাইকে ডাকিয়া সকলে একসাথে ভোগাগারে উপস্থিত হইলাম। শেষ হইয়া আসিল আজ এই এবারের মতন আমাদের এস্থানে আসা—এবং প্রিয় পুত্রের মাতৃগৃহে বসিয়া আহার করার অদ্যই শেষ রজনী—ইহা ভাবিয়া পূজনীয়া ঠাকুরমাতা নিজ-হস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নানাবিধ আহার্য্য খাওয়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আজিকার এই আহার-পর্ব্বের মধ্যে যেন কি এক ব্যথা-ভরা ভাব মায়ের মনে ফুটিয়া উঠিতেছে। দাদুভাইও আহারে বসিলেন, কিন্তু অন্যান্য দিনের ন্যায় আজ আর তাঁহার হাস্যালাপ কিছুই নাই,—নিঃশব্দে খাইয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগও যেন অন্যান্য দিনের মত অত উজ্জ্বলতর লাগিল না। যাহা হউক, আমরা প্রতিদিনের ন্যায় প্রসাদাদি সকলেই গ্রহণ করিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর অধিকক্ষণ বিলম্ব না করিয়া শয়ন করিতে চলিয়া গেলেন।

... ...

আজ বুধবার ১৪ই জুন। ভোরে নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

আজই আমাদের এখানকার আসন তুলিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে এই গৃহের পুত্র-বিহীন অবস্থাটি, বৃদ্ধ পিতামাতার মুখ দুটি আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সাথে সাথে আমাদের মন ব্যথায় ভরিয়া গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর নীচে নামিয়া আসিলেন ও যথাযথ প্রাতঃকালীন যাবতীয় কর্ম্ম শেষ করিয়া বাহিরের ঘরে আরাম কেদারায় উপবেশন করিলেন। আজিকার সকালটি এক অদ্ভুত ভাব ধারণ করিয়াছে। একের পর একে যাহার যাহা প্রাণের কথা, মনের ব্যথা, যাহার যাহা কিছু ক্ষুব্ধ সঞ্চিত আছে, স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করিতেছে,—তৎসমুদয় অতি গোপনে ধীরে ধীরে শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছেন। আর শ্রীশ্রীঠাকুর কতরূপে কতভাবে সান্ত্বনা দিতেছেন, যাঁহার প্রতি যে ব্যবস্থা প্রযোজ্য তাঁহাকে তাহা দিয়া শান্তি-সোয়াস্তি দিতে চেষ্টা করিতেছেন।

এরই ভিতরে স্থানীয় কয়েকটি ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনেচ্ছায় ঘুরিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের—অচঞ্চল, ধীর-স্থির। এই বাড়ীর প্রত্যেকে আসন্ন বিরহ-ব্যথায় নয়নাশ্রু বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। পুত্রহারা সেই জননী—যাঁহার শোকচিত্র পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সেই নীহার-মা আজ আর কোন কথাই বলিতেছেন না। আজ আর ইঁহার যেন কিছুই বলিবার নাই। ইনি আজ নীরব থাকিয়াই শ্রীচরণে সকল ব্যথা অর্পণ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহের ভগ্নী স্নেহময়ী-মা পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া শিষ্যার ন্যায় উপবিষ্টা। ধীরে মৃদুকণ্ঠে অশ্রুভরা নয়নে কত কথাই না তিনি বলিতে চাহিতেছেন কিন্তু বলা যেন আর হয়ে ওঠে না। কি যেন মীমাংসা করিয়া না নিলে ইঁহার জন্মজীবন অপূর্ণ রহিয়া যায়। কি অপূর্ব্ব ভ্রাতৃভক্তি কি নিষ্ঠা, কি শ্রদ্ধা লইয়া সে ভ্রাতৃভক্তি গুরুভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে! ভগ্নীর সহিত আলোচনায় নিরত আছেন, এমন সময় কাকুজী বাহিরের বারান্দায় জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিলাম। ঠাকুরের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি অতি সত্বর ক্ষিপ্রগতিতে গিয়া কাকুজীর পৃষ্ঠে হাতখানি রাখিতেই, বারিপূর্ণ কুম্ভপ্রায় স্পর্শমাত্রেই অশ্রুভারাক্রান্ত চিত্তটি তাঁহার উছলিয়া উঠিল। বালকের ন্যায় কাকুজী কাঁদিতে লাগিলেন। সে কী কান্না! ঠাকুর নানারূপ সান্ত্বনা দিয়া কনিষ্ঠকে শান্ত করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সহোদরা ভগ্নী যথার্থই তাঁহাদের দাদার পরিচয় পাইয়াছেন। দাদাকেই ইঁহারা গুরুপদে বরণ করিয়া লইয়াছেন। কাকুজীর নিকট গুরুভক্তি শিক্ষার বস্তু। এই উদ্বেল অশ্রুধারা তাহার প্রমাণ।

এবারে মঞ্জু-মা আসিয়া সংবাদ দিলেন অষ্টম-বর্ষীয়া বালিকা "মীরাভাই" তাঁহার—তাঁহাকে গোপনে বলিয়াছে—"দিদি, আজ আমার বুকের ভিতরটা কি রকম একটা করছে, বড্ড কষ্ট হচ্ছে।" এ বালিকার-ও প্রাণে আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনা ধাক্কা মারিয়াছে।

বৃদ্ধ দাদুভাই আজ নিস্তব্ধ।.........

ঠাকুরমার কথা কিছু নাই বলিলাম।.........

❈ ❈ ❈ ❈

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের সময় হইল। পূজনীয়া ঠাকুরমাতা কম্পিত হস্তে অতি সযত্নে আদরের দুলালের ভোগের সরঞ্জামগুলি সজ্জিত করিতে লাগিলেন। পরে পূজনীয় দাদুভাই ও শ্রীশ্রীঠাকুর আসনে উপবিষ্ট হইলে পুত্রের অতি নিকটে বসিয়া—নয়ন দুটি অশ্রুপূর্ণ করিয়া, কম্পিত জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "খাও বাবা, আমি হাতে করে তোমায় তুলে দিই। আবার কত দিনে দেবো—দেবো কি না দেবো, কে জানে।"—এই বলিয়া সারা সকালটি বসিয়া বসিয়া তিনি পুত্রের সাধের যা-কিছু রাঁধিয়াছিলেন তাহা একটির পর একটি থালার উপর তুলিয়া দিতে লাগিলেন। চামচ—কোনটি থালা পর্য্যন্ত পৌঁছাইতেছে, কোনটি হয়ত কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছে।

দাদুভায়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি কি জানি কখন উঠিয়া গিয়াছেন। যাহা কিছু তাঁহাকে আহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা প্রায় সমস্তই পাথরের থালাখানির উপর পড়িয়া রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ গ্রহণ সমাপ্ত হইল। তিনিও কি কিছু গ্রহণ করিলেন? মাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বিবিধ পদ স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র। ঠাকুর বাহিরের ঘরের দিকে চলিয়া গেলে

আমরা সকলে খাইতে বসিলাম এবং ঠাকুরমাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিতে তিনিও এক সাথে খাইতে বসিলেন।

আমরা যে যেমন পারিলাম অল্প-স্বল্প খাইয়া উঠিলাম, পূজনীয়া ঠাকুরমাতা নাম মাত্র আহারে বসিয়া উঠিয়া পড়িলেন। অদ্ভুত-ভাবে সমস্ত দেহখানি তাঁহার কম্পিত হইতেছে। বুকফাটা রোদন দমন করিতে গিয়াই তাঁহার এইরূপ কষ্ট হইতেছে।......



প্রত্যাবর্ত্তন পর্ব্ব

দেখিতে দেখিতে আমাদের যাইবার সময় প্রায় হইয়া আসিল। ঘড়িতে এগারটা প্রায় বাজিয়াছে এমন সময় ট্যাক্সিখানি আসিয়া দাঁড়াইল। ট্যাক্সির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই মুখগুলি বিবর্ণ হইয়া এক অদ্ভুত ভাব ধারণ করিল। কি বিষাদ-মলিন এ মুখভাব!

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে আমাদের সাথে যাহা যাইবে সেই মালপত্রগুলি বাহিরের দালানে একে একে একত্রিত করা হইল। সারা সকালটা আজ বিভূতিভূষণ আর সকলের সাহায্যে মালগুলি গুছাইয়াছেন ও বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। তাই মাল জড় করা সহজ সাধ্য হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। এইরূপে আমাদের সকলের সকল কাজ সারা হইলে বিদায়ের মূঢ়-মুহূর্ত্ত আসিয়া পড়িল। এইবার প্রণামের পালা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই যে বিদায়-পর্ব্ব—ইহার রূপ কতবার কতস্থানে কত ভাবে আমরা দেখিয়াছি। ধনী-মধ্যবিত্ত-নিঃস্ব নির্ব্বিশেষে—প্রত্যেকেই দুই চারিদিন ইঁহার পূজা করিয়াছেন, এবং ধনী অট্টালিকা হইতে, মধ্যবিত্ত গৃহ হইতে, দরিদ্র কুটির হইতে পরমারাধ্য শ্রীগুরুভগবানকে প্রণাম করিয়া বিদায় দিয়াছেন। তাঁহার কাছে ধনী নাই, নির্ধন নাই, পুরুষ নাই, নারী নাই। তিনি সকলের নিকটেই বিদায় লইয়াছেন—ভিখারী রূপে। প্রেমের কাঙাল ঠাকুর বিদায়-বেলায় ভক্তের দেওয়া

কণ্ঠের মালাটি দোলাইয়া,—এই মালার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে ভক্তবৎসল ভক্তের মন দোলাইয়া, প্রেমপূর্ণ লোচনে আভাসে ইঙ্গিতে ইশারায় যেন বলিয়া আসেন,—"আমায় বিদায় দিসনে। ভুলে বিদায় দিলে-ও এমন বিদায় দিসনে যাতে তোদের অন্তরে ঢোকার পথ আমার রুদ্ধ হয়ে যায়।"

শ্রীশ্রীঠাকুর ৺শালগ্রাম জিউর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং অল্পক্ষণ মন্দির-মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিয়া বাহিরে আসিলেন। এবারে সবাই দেখিলাম,—শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানি নবভাব ধারণ করিয়াছে। ধীরে পূজনীয় দাদুভায়ের শ্রীচরণে নত হইয়া তিনি মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। সেই স্থানে দণ্ডায়মান স্নেহময়ী ঠাকুরমাতার শ্রীচরণদুটি দুই হস্তে ধারণ করিয়া জানু পাতিয়া অতি ব্যস্ত হইয়াই যেন প্রণামটি সারিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং জননীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মা, তুমি কাঁদবে না"।

জননী যেভাবে উত্তর দিলেন—সে স্থানে যে যে ছিলেন সকলেই বুঝিলেন যে কী নিদারুণ এই উত্তর। অশ্রুপূর্ণ লোচন-দুটি প্রাণাধিক পুত্রের দিকে তুলিয়া কম্পিত কণ্ঠে ক্ষীণস্বরে উচ্চারিত হইল,—"না বাবা, আমি তো কাঁদিনি—একটুও কাঁদিনি এই দেখ্।"

দেখিলাম, তখনও ওষ্ঠাধর থর থর কম্পিত হইতেছে। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ভয় হইল, কি জানি মূর্চ্ছিতা হইয়া না পড়েন। আমি ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরমাকে বুকে চাপিয়া ধরিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় ভগিনী, স্নেহের ভ্রাতা ও আদরের দুলালী মীরা দেবীর দিকে আমরা চাহিয়া দেখিলাম। মঞ্জু-মা তাঁহার গুরুজনদিগকে একে একে প্রণাম করিয়া সর্ব্বশেষে পূজনীয়া ঠাকুরমাতার নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি সস্নেহে প্রিয় নাত্নীর মুখ তুলিয়া দুটি প্রগাঢ় স্নেহ-চুম্বন দুই-গণ্ডে, ও মস্তকোপরি স্নেহাশীষের ন্যায় একটি চুম্বন-স্পর্শ দিয়া দুই হস্ত দিয়া দেহ তাঁহার বক্ষোপরি চাপিয়া ধরিলেন।

শুনিলাম মীরা-মা বাহিরের দালানে একাকিনী ধাপির উপর দুই হাত দিয়া তাহার ছোট্ট মুখখানি আচ্ছাদিত করিয়া অত্যন্ত রোদন করিতেছে। ছুটিয়া গিয়া সকলেই একে একে এই ছোট্ট বালিকাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে কি তখন কাহারও কথা মানে। সে ভূমিতে পড়িয়া এত রোদন করিতে লাগিল যে আমরা সকলে নিরুপায় স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। জ্ঞান হইবার পর সর্ব্বসমেত মীরা-মা বোধ হয় ঠাকুরকে মাত্র একমাস দেখিয়া থাকিবে। এইরূপ রোদন ইতিপূর্ব্বে কখনও আমার দৃষ্টি-পথে আসে নাই। এ কোন কথাই বলিতেছে না, থাক বা যেওনা —এ চিন্তাও যেন ইহার মধ্যে নাই! মীরা-মার অভাবনীয় অশ্রুবর্ষণে সকলেই বিদায়-মুহূর্ত্ত বিস্মৃত হইয়া আত্মভোলাভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। না জানি, ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরের কি এক চতুরালি! এইরূপ একটি হৃদয়স্পর্শী ব্যবস্থা না হইলে ইঁহাদের সকলকে বিরহ-ব্যথা-সাগরে ভাসাইয়া কখনই তিনি বাহির হইতে পারিতেন না। কিন্তু এই এক কৌশলে শ্রীশ্রীঠাকুর গৃহের

বাহিরের প্রাঙ্গণ পার হইবার পূর্ব্বে গর্ভধারিণী জননীর ভারাক্রান্ত মুখমণ্ডল খানিকটা উৎফুল্ল করিয়া তাঁহার নিকট সানন্দচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর শ্রীশ্রীঠাকুর গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার, ক্ষণপূর্ব্বে যে স্নেহাসক্তা পুত্র-বিরহে কাতরা বৃদ্ধা-জননী পুত্রকে বিদায় দিতে হইবে ভাবিয়া বেতস-পত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছিলেন, তিনি এক্ষণে ঐ ক্ষুদ্র বালিকাটির অশ্রু-প্লাবিত মুখখানি মুছাইতে মুছাইতে বলিতেছেন, "তোমায় আশ্রমে পাঠিয়ে দেব—তুমি কেঁদো না।" বৃদ্ধা নাত্‌নীকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই অবসরে আমরাও একে একে গাড়িতে উঠিতে যাইবার ইচ্ছায় আর একবার সম্মুখে দাদু-ভাইকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম, বলিলাম—"আসি দাদুভাই।" তিনি একটি ছোট্ট কথা বলিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া দিলেন, "তোমরা আমায় ভুলে যেও না কিন্তু।" বলিলাম,—"দাদুভাই, আপনি আমাদের মনে রাখবেন, ভুলে যাবেন না যেন।" মৃদু করুণ হাসিয়া দাদুভাই আমাদের উত্তর দিলেন, "না, তোমাদের কিছুতেই ভুলবো না। তোমাদের যদি ভুলে যাই, ভগবানকেও ভুলে যাব।"

এই কথা কয়টি শুনিয়া আমাদের অশ্রু আর বাধা মানিল না।—আর পিছন ফিরিয়া চাহিবার মত অবস্থা আমাদের রহিল না।

*   *   *   *

সকলে গাড়ীতে উঠিতেই গাড়ী চলিতে সুরু করিল শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে। সকলেই মুখ বাড়াইয়া হস্তোত্তলন করিয়া যাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাদের "জয় গুরু" বলিয়া সাদর অভিবাদন জানাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে "জয় ৺বাবা বৈদ্যনাথ" বলিয়া তিনবার শ্রীশ্রীঠাকুর শিবজয়-ধ্বনি উচ্চারিত করিলেন। আমরাও তিনবার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সে জয়ধ্বনিতে যোগ দিলাম।

গাড়ীখানি যতক্ষণ না বাঁকের মুখে আসিয়াছে, দেখিলাম, যাঁহারা বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের একজনও এক পাও সরেন নাই। গাড়ীখানি ক্রমে জসিডি ষ্টেশনে যাইবার রাস্তায় পড়িল। প্রশস্ত রাস্তার দুইধারে কোথাও বৃক্ষ, কোথাও গৃহ, কোথাও শুধু খেলার মাঠ। এক একটি করিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া গাড়ী আগাইয়া চলিল। ক্রমে গাড়ী দারোয়া নদীর সম্মুখীন হইল। দারোয়ার উপরিস্থিত সেতুটিও পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা পরে জসিডি ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছাইলাম। কাকুজী জসিডি ষ্টেশন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া আমাদের ট্রেণে তুলিয়া দিবেন।

সকলে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। মুরলীমোহন কাকুজীকে সঙ্গে লইয়া টিকিট কাটিতে গেলেন। ইঁহাদের অপেক্ষায় না থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের সকলকে লইয়া প্ল্যাটফর্মের একটি মুক্তস্থানে বসিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই মুরলী-মোহন সেই স্থানে আসিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়া ঐ ষ্টেশনে রেলওয়ে কর্ম্মচারী আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীধীরেন সিংহ সস্ত্রীক পুত্রকন্যাসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আরও দুই-তিনজন গুরু-ভ্রাতা ও ভগ্নী আসিয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন।

সংবাদ লইয়া জানা গেল, ট্রেণখানি নির্দ্দিষ্ট সময়েই আসিতেছে। বারটা চব্বিশ বাজিয়াছে—এই সংবাদ শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাইয়া দেওয়া হইল ও সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বিরাট ট্রেণখানি ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে সশব্দে প্ল্যাটফর্মের পাশে প্রবেশ করিতেছে। কুলিদের ডাকিয়া সত্বর মালপত্রগুলি উঠাইতে বলা হইল। কিন্তু গাড়ীখানির অবস্থা ও প্ল্যাটফর্মের জনস্রোত দেখিয়া আমরা সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। গাড়ীতে আরোহণ করা এক রকম অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। তবুও উপায় নাই। জনস্রোত কোন রকমে ঠেলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মালপত্রসহ একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরার নিকট পৌঁছাইলাম। ঐ কামরার দরজাটি কোন রকমে অল্প খুলিয়া দেখা গেল সেটি "কুপে", অর্থাৎ সেটিতে আছে মাত্র দুখানি 'বার্থ'। প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠিলেন। পরে মঞ্জু-মা ও আমি উঠিলাম। কুলিদের হাত হইতে এক একটি করিয়া জিনিষ-পত্র আমরা গাড়ীর ভিতর উঠাইতে লাগিলাম। হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর মুরলীমোহনকে তুলিয়া দিবার জন্য বিভূতিভূষণকে আদেশ করিলেন। মুরলীমোহন উঠিবামাত্র ট্রেণখানি ছাড়িয়া দিল। ব্যস্ত বিভূতি-

ভূষণ ও রাধাগোবিন্দ কয়েকটি মালপত্র সমেত তখনও প্ল্যাটফরমে পড়িয়া রহিয়াছেন। বিভূতিভূষণ চীৎকার করিয়া হাঁকিলেন, "মুরলীদা, চেন টানিয়া দিন।" এদিকে ট্রেণের ভিতর অবস্থা সঙ্গীন, মানুষে মালপত্রে গাড়ীখানি প্রায় ঠাসা। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং চেন টানিয়া গাড়ীখানি থামাইলেন। গাড়ী থামিল বটে, কিন্তু মালগুলি তোলা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। আমরা তো গাড়ী থামাইলাম। অন্য দুই তিনটি যাত্রী তাঁহাদের বিরাট বিরাট মালপত্র এ গাড়ীতেই উঠাইতে আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক এই ডামাডোলের মধ্যেই অল্প সময়ের মধ্যে অতি কষ্টে এবং অত্যন্ত তৎপরতার সাথে মালগুলি উঠাইয়া বিভূতিভূষণ ও রাধাগোবিন্দ হাঁপাইতে হাঁপাইতে কায়ক্লেশে ট্রেণে উঠিলেন। বিভূতিভূষণ এ কামরার খোলা দরজার উপর ট্রাঙ্কটি রাখিয়া সেই ট্রাঙ্কটির উপর একপাশ হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এইভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, শুনিতে পাইলাম একটি প্যাণ্ট কোটধারী পাঞ্জাবী ভদ্রলোক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "ইয়ে সব বড়া বড়া সামান ব্রেকমে নেহি দেকে ইহা পর উঠা রহেঁ হ্যায়— ইয়ে ব্রেকমে দেনা ঠিক হ্যায়।

এই কথা শুনিয়া সদা-বিনীত বিভূতিভূষণ একটি তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া বসিলেন। কি জানি মঙ্গলময়ের কোন নিগূঢ় মঙ্গল ইহাতে নিহিত ছিল। বিভূতিভূষণ এই ভদ্রলোকটীকে অতি রুক্ষস্বরে ইংরেজীতে বলিয়া ফেলিলেন,—আপনার যদি কিছু

বলবার থাকে তা আপনি রিপোর্ট করতে পারেন। ("If you have got anything to say, better report")

এই কথা মুখ দিয়া বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যক্তি ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—ওঃ! রিপোর্ট কি করব! এই সব কিছু আমি বাইরে ফেলে দেব, মশাই। ("O Report! I will throw these out, Man!)

এই ভদ্রলোকটি এত বেশী ক্রোধান্বিত হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার নিজেকে সামলাইবার আর অবস্থা রহিল না। বারবারই তিনি ঐ একটি কথা বলিয়া শাসাইতে লাগিলেন। বিভূতিভূষণ এই ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। রক্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এবারে তিনিও গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ফেলুন দেখি! আর দেখুন—আমি আপনার মাথার খুলি উড়িয়ে দিচ্ছি। (Yes, do it! And you see, I knock your brain out!)

একটা হাতাহাতির উপক্রম হয়-হয়, এমন সময় ভক্ত-বৎসল শ্রীশ্রীঠাকুর ইঙ্গিতে বিভূতিভূষণকে শান্ত করিলেন, এবং পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির হস্তদ্বয় শ্রীকরকমলে ধারণ করিয়া বলিলেন, "আপ চুপ হো যাইয়ে—মেহেরবানি করকে আপ্ চুপ হো যাইয়ে।"

একটি বিহারী ভদ্রলোক অল্পদূরে বসিয়াছিলেন। তিনি তখন এই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটিকে বলিলেন, "আরে ভাই, সান্ত হ্যাঁ, কেয়া কর রহে হো—ইয়ে কেয়া বাত হ্যায়—এক্কা গলতি হো গিয়া, দুস্‌রা মাফি মাঙ্গ রহে হ্যাঁ।"

এইরূপ অবস্থা! ট্রেনের ভিতরটা একটি বিশ্রীভাব ধারণ করিয়াছে! আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম,—ঐ পাঞ্জাবী ভদ্রলোক হঠাৎ মুখখানি অতি করুণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিয়া উঠিলেন, "স্বামীজী, আপ কেঁও এ্যায়সা কর্ রহে হ্যায়!" কী যাদুস্পর্শে, দেখিলাম—ইতিমধ্যে তাঁহার মুখখানি শ্বেত-পাথরের মতন সাদা ও ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে! শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাঁহার হস্তদ্বয় ছাড়িয়া দিলেন।···

বিভূতিভূষণ এখন তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনায় স্তব্ধ। যাহা হউক, পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও আমি পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির সহিত কথোপকথন করিলাম। বিভূতিভূষণের সহিতও ঐ ভদ্রলোক পরে দু'একটি কথা বেশ ভালভাবেই বলিলেন। সকলই শ্রীশ্রীঠাকুরের খেলা।

গাড়িখানি মধুপুর ষ্টেশনে থামিলে মালপত্রসহ শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সকলে নামিয়া গেলে বিভূতিভূষণ ঐ পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের নিকট নিজ হঠকারিতার জন্য ক্ষমা চাহিয়া নামিয়া আসিলেন।

··· ··· ···

এইবার আমরা মধুপুরেই যে গাড়ীখানি গিরিডি যাইবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে উঠিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্রামাগারে একটি নবাগত ভদ্রলোকের সহিত আলোচনা করিয়া ট্রেন ছাড়িবার পূর্ব্বে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ট্রেনে আসিয়া উঠিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন-খানি ছাড়িয়া দিল। এই অপরিচিত ভদ্রলোকটি আসিয়া বসায় আমরা কেহই নিজেদের মধ্যে কোন আলোচনা করিতে পারিতে-

ছিলাম না। শ্রীশ্রীঠাকুর ও সেই ভদ্রলোকটি মাঝে মাঝে দু'একটি কথা কহিতে লাগিলেন।

গিরিডিতে যখন আসিয়া পৌঁছাইলাম তখন বৈকাল সাড়ে চার ঘটিকা। ট্রেনের দরজা খুলিতেই বাবুলালকে সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। ট্যাক্সিখানি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কুলির দ্বারা মালপত্রগুলি কতক সাজাইয়া দেওয়া হইল। রাধাগোবিন্দের তত্ত্বাবধানে চায়ের দোকান হইতে চা প্রস্তুত করাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর চা পান করিলেন ও আমরা প্রসাদ পাইলাম।

পূর্ব্বে কথা ছিল গিরিডি হইতে যে বাস হাজারিবাগে যায় তাহাতে আমাদের বড় মালগুলি উঠাইয়া দিয়া রাধাগোবিন্দকে মালের সহিত পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। বাবুলাল সংবাদ দিল,—একখানি খালি ট্যাক্সি হাজারিবাগে ফিরিতেছে, সামান্য কিছু দিলেই মালপত্রগুলিসহ রাধাগোবিন্দকে আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিবে। একথা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর অনুরূপ ব্যবস্থা করিলেন। আমরাও বাবুলালের গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

গাড়ীখানি গিরিডি ছাড়িল। ইহার পূর্ব্বেই মধুপুর হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই দুর্দ্দান্ত বারিপাতের মধ্য দিয়া বাবুলালের গাড়ীখানি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বুকে করিয়া চলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে সাধ্যমত ধীরে ধীরে বাবুলাল গাড়ী চালাইতে লাগিল। অর্দ্ধপথে একবার দেখা গেল, যে ট্যাক্সিখানিতে রাধাগোবিন্দকে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। বাবুলালকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা

করায় সে বলিল, "বহুত জোর পানি বর্ষাতা হ্যায়, উসকে ওয়াইপার নেহি হ্যায়। পানি রুক যানেসে ঠিক চলা আয়েগা।"

আরও খানিক আগাইয়া আসিয়াছি। এইবার আমরা পরেশনাথ পাহাড়ের পার্শ্বে আসিয়া পড়িলাম।

৺বৈদ্যনাথ যাইবার সময় আমাদের পরেশনাথ পাহাড় দেখিবার কথা ছিল। তখন হয় নাই। এবারে একে তো ৺বৈদ্যনাথেই দেরি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই দুর্দ্দান্ত ঝড় ও বৃষ্টি। এই সকল কারণে শ্রীশ্রীঠাকুর এবারেও পরেশনাথ দেখা বন্ধ করিয়া দিলেন। কাজেই দূর হইতে পরেশনাথ দেখিতে দেখিতে আমরা পরেশনাথ পশ্চাতে রাখিয়া হাজারিবাগ-অভিমুখে চলিলাম। যাহা কিছু যাইবার সময় এই পথে দেখিয়াছিলাম, একে একে সবই পশ্চাতে ফেলিয়া চলিলাম।......

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। দুই ঘণ্টা পনের মিনিটের মধ্যে, পৌনে সাত ঘটিকায় আমাদের মোটরখানি আশ্রমের দ্বারে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিতেই আশ্রমের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যে যেখানে ছিলেন ছুটিয়া আসিলেন, এবং শঙ্খধ্বনি, জয়ধ্বনি ও হুলুধ্বনি সহকারে তখনি চার-পাঁচটি গোড়ে-মালা শ্রীশ্রীঠাকুরের কণ্ঠে পরাইয়া সানন্দে তাঁহাকে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বরণ করিয়া লইলেন।

সপ্তাহ পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পাইয়া সকলের নয়নে এক বিমলানন্দ ফুটিয়া উঠিল। এবং তাহারই সাথে সাথে কণ্ঠের পুষ্প-মাল্যেরই মত আরাধ্য দেবতার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত করিয়া একটি

প্রেমসূত্রে গ্রথিত মাল্যের ন্যায় আশ্রমস্থ সেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীচরণে নত হইয়া শোভিত হইলেন।...

সন্ধ্যা-আরতি সুরু হইল। তারই সাথে পাগল-পারা মন গাহিয়া উঠিল--

"আরতি উঠে বাজিয়া ধীরে
সৌরভ ছুটে মৃদু সমীরে,
প্রেম-কমল হাসে, ভাসে,
শান্ত মবম-সরসে।
সংশয়, দ্বিধা, তর্ক, দ্বন্দ্ব,
দূরে যায়, বিমলানন্দ
পানে, জ্ঞাননয়ন, সফল,
প্রীতি-অশ্রু বরষে।"

... ...

আরতি-অন্তে প্রার্থনা করিলাম—

"অসতো মা সদ্ গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যো র্মা অমৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম্ম এধি
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

"—হে সত্য-স্বরূপ, অসত্য হইতে তুমি আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও।

—হে জ্ঞান-স্বরূপ, অন্ধকার হইতে তুমি আমাদিগকে আলোকে লইয়া যাও

—হে অমৃত-স্বরূপ, মৃত্যু হইতে তুমি আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও।

—হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও।

—হে রুদ্র, তোমার—যে অপার করুণা, তাহা-দ্বারা আমা-দিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।"

ওগো শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্!—

"জন্ম নিয়েছি ধূলিতে,
দয়া করে দাও ভুলিতে,
দাও ভুলিতে!"

... ...

প্রার্থনান্তে শ্রদ্ধাবনত-চিত্তে পথদর্শী জীবন-সারথী বিরাট মহাপুরুষের শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করিলাম।...

ভক্তি-বিগলিত হৃদয়ে ভূলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে গুরু-প্রণাম উচ্চারণ করিলাম—

ওঁ ক্ষৌমবস্ত্রং ক্ষমাযুক্তং প্রেমভক্তি প্রদায়কং
বিরাট পুরুষং সৌম্যং বিশ্বজিতং নমাম্যহম্।
—বিশ্বজিতং নমাম্যহম্, বিশ্বজিতং নমাম্যহম্॥

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥



শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১	বুৎপত্তি	ব্যুৎপত্তি
”	৮	মনে মনে প্রাণে	মনে-প্রাণে
৯	৯	কর্ম্ম সংন্যাস	কর্ম্ম-সন্ন্যাস
১০	৩	এবম্বিধ	এবংবিধ
১৪	৯	রাত্রি	রাত
২০	৯	উর্দ্ধে	ঊর্দ্ধে
৩২	৩	াকন্তু	কিন্তু
৪৩	৪	ঝড়িয়া	ঝরিয়া
৪৫	১৫	শ্রীপাঠে	শ্রীপাটে
৪৬	১৫	আখিদ্বয়	আঁখিদ্বয়
৪৮	১৯	সামা	সীমা
৪৯	১৮	মনি	মণি
৫৪	১১	র্ব্বরুণ	র্বরুণ
৫৫	৫	পয়ষট্টি	পঁয়ষট্টি
৫৮	২১	খেলাঘব	খেলাঘর
৬০	১৩	সেহজন্য	সেইজন্য
৬১	১	ইহা	ইহার

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৫	৭	মন্দিরে	মন্দিবেব
৬৬	১০	চক্ষুরুন্মিলীতং	চক্ষুরুন্মীলিতং
৭০	৭	হইয়াও	হইলেও
৭৬	১৯	বষণ	বর্ষণ
৭৭	১১	দোষারূপ	দোষাবোপ
৭৮	১০	সেবা	'সেবা'র
৮০	৪	তাবই	তাঁবই
৮১	৪	বর্যণ	বর্ষণ
,,	৫	পাগল পাবা	পাগলপারা—
,,	৭	প্রচেষ্টা	প্রচেষ্ট
৮৩	২১	এব	এঁব
,,	২১	তাহাব	তাঁহাব
৮৬	৬	সেদিক	সেদিকে
,,	১০	বিযয়ে	বিষয়ে
৮৭	১	প্রভৃতি বিজয়ী —	প্রকৃতি-বিজয়ী
,,	১	যতই না	যতই
,,	৩	করেন,	করিতেছে—
,,	৪	কাম	—
,,	,,	মোহকে সহ তাঁহাদের	মোহ
,,	৫	হইয়াছে	হইতেছে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৭	৮	কবেন	করিতেছেন
৮৯	১২	বর্য	বর্ষ
৯১	১৭	সগুণৈঃ	স্বগুণৈঃ
৯১	১৩	পুত্রা পরাধাতা	পুত্রাপরাধাৎ
"	"	কুঃ পতি	কুপ্যাতি
৯৪	২	মুর্ত্তি	মূর্ত্তি
৯৬	২১	অবশ্যি	অবশ্য
৯৯	১৬	:তেবনি	তেমনি
১০১	১২	একথানি	একখানি
১০৩	৩	মুহুর্ত্ত	মুহূর্ত্ত
১০৪	২২	:যে	যে
১০৫	৬	মুহুর্ত্ত	মুহূর্ত্ত
"	৯	উচ্চাবিত	উচ্চারণ
১০৭	৭	শ্রীশ্রীঠাকুরেয়	শ্রীশ্রীঠাকুরের
"	১০	পর্ষ্যন্ত	পর্য্যন্ত
"	১৭	মুরারীমোহন	মুরলীমোহন
১০৮	১৭	যত্ত্বে	যত্ত্বে
১০৯	১	যৎ সামান্ত	যৎসামান্ত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
”	২১	ননে	মনে
১১০	১৭	পর্ষ্যন্ত	পর্য্যন্ত
”	২০	ষখন	যখন
”	২১	যায়	যায়
১১২	১৬	যান	যান
